সার তৈরি ও ব্যবহার

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

সার তৈরি ও ব্যবহার

COMPLIMENTARY

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SAAR TAIRI O BYABAHAR
[Preparation of Fertiliser and its use]
Satyaranjan Biswas

প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৮৮

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রাকর :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : প্রদীপ সাহা

মূল্য : নয় টাকা

Published by Shri Sibnath Chatterjee, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

উৎসর্গ

সার সমাচার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক

শিবদাস রায়

প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

যে কোন চাষী চান তাঁর চাষের জমি থেকে অধিক ফলন তুলতে। এ কাজে সারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চাষবাসের প্রযুক্তিগত পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। চাষবাস কিছুটা জটিল হয়ে পড়ছে। কম খরচে ও জমি থেকে উন্নত মানের বেশি ফলন তুলতে এবং ফসলের গুণগত মান বাড়াতে চাষীকে বৈজ্ঞানিক চাষের নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। জমির উর্বরাশক্তি বজায় রেখে জমিতে ফলন বাড়াতে সারের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু কোন জমিতে কোন ফসলে কোন সারটি কতটা কার্যকরী, অধিকাংশ চাষীই এখনও তা না জেনেই চাষ করেন। ফলে একদিকে সারের অপচয় হয় এবং অন্যদিকে চাষী তাঁর কাঙ্খিত ফলন না পেয়ে হতাশ হন।

আমাদের দেশের জমির মাটির চরিত্র নানা রকম। বিভিন্ন রকম সারও এখন পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। সব রকমের সার এসব মাটিতে সমানভাবে কার্যকরী নয়। বিভিন্ন সারের রাসায়নিক চরিত্র ও ব্যবহারিক গুণাগুণের মধ্যেও আছে পার্থক্য। এই পরিস্থিতিতে নানাধরণের সার পরিচিতি, সার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ে নানা ছকসহ বইটি লেখা। ফসল অনুযায়ী তাদের চাহিদাও নানারকম। আবহাওয়া, মাটি, ফসল, ঋতু ইত্যাদির উপর সারের চাহিদা নির্ভরশীল। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্য থেকে সার প্রয়োগকারীকে সার নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হয়। আবার দূর দূরান্তের হাটে-বাজারে সব সময় সঠিক সার পাওয়া যায় না। এছাড়া নিত্য নতুন নানা ধরণের সারও বাজারে আসছে। এ পরিস্থিতিতে কৃষক, কৃষিকর্মী, সার ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বিভ্রান্ত। নানা প্রশ্ন তাঁদের সামনে।

সারবিজ্ঞানের উপর ইদানীং কিছু বাংলা বই প্রকাশিত হলেও তা সংখ্যায় খুবই কম। সার প্রয়োগ সংক্রান্ত কৃষি পুস্তিকাও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্থা প্রকাশ করে বিলি করে থাকেন। এ বইটিতে প্রায় সব তথ্যাদি একত্রে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ডঃ তারকমোহন দাস আমাকে এরকম কাজের দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দেবার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে বারবার বলেছেন– যে বইটি যাতে সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়, বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত চাষী, বিদ্যালয়ের ছাত্র, সাধারণ গৃহস্থ, এমন কি সাধারণ গৃহবধূও কিচেন গার্ডেন বা ফুল বাগান করতে এই

বইয়ের সাহায্য নিতে পারে এমনভাবে লিখতে হবে। টেকনিক্যাল শব্দের ব্যবহার বেশি না থাকলেই ভাল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের তৎকালীন চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা মহাশয় নানাভাবে উৎসাহিত না করলে এই বইটি প্রকাশিত হত না বলেই আমার ধারণা।

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষার দ্বিস্তর দায়িত্বে ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কৃষিবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ নেপালচন্দ্র দেবনাথ ও প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। সার সমাচার পত্রিকার সম্পাদক শিবদাস রায় ও শ. ওয়ালেশ কোম্পানীর সার ও কীটনাশক বিভাগের রিজিওনাল সেলস একজিকিউটিভ বলাইচন্দ্র রায় দুজনেই নানা তথ্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। এদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞা জানাই।

পুস্তকটি প্রকাশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীরামপুর, হুগলী
আগষ্ট, ১৯৮৮

সত্যরঞ্জন বিশ্বাস

সার তৈরি ও ব্যবহার

সূচীপত্র

ছক পরিচিতি ঃ

অধ্যায় ১

সার ও তার ব্যবহার

সার কি ও কেন?

মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য উদ্ভিদখাদ্য সম্বলিত যে সব জৈব ও অজৈব পদার্থ খামারে ও কারখানায় তৈরি হয় এবং মাটিতে প্রয়োগ করা হয় তাদেরকে সার বলা যায়। ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সারের প্রয়োজন।

জৈব ও অজৈব যে কোন উপাদানের আকারে সার মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। প্রাণী দেহ রক্ষা ও বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্য ও পুষ্টি প্রয়োজন তেমনি গাছ-পালারও এজন্য দরকার খাদ্য ও পুষ্টি। সার প্রধানত মাটির মাধ্যমে গাছ-পালার খাদ্য সরবরাহ তো করেই, উপরন্তু গাছের দেহ-গঠনে ও রোগ প্রতিরোধেও সহায়ক হয়। সবচেয়ে বড় কথা সার গাছের ফলনবৃদ্ধি ঘটায়।

গাছপালার খাদ্য উপাদান ঃ

মানুষের মত গাছপালারও প্রয়োজন বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য মূলত ১৬ টি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন আছে। এরা হল (১) কার্বন (২) হাইড্রোজেন (৩) অক্সিজেন (৪) নাইট্রোজেন (৫) ফসফরাস (৬) পটাসিয়াম (৭) ক্যালসিয়াম (৮) ম্যাগনেসিয়াম (৯) সালফার (১০) লোহা (১১) দস্তা (১২) তামা (১৩) ম্যাঙ্গানিজ (১৪) বোরন (১৫) মলিবডেনাম ও (১৬) ক্লোরিন।

এরমধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই ৩টি উপাদান গাছপালা বাতাস ও জল থেকে নেয় বলে সাধারণতঃ এগুলিকে খাদ্য (সার) হিসাবে ধরা হয় না। যদিও এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। কারণ এই ৩টি উপাদান দিয়েই শস্য দেহের ৯৫-৯৯ শতাংশ সৃষ্টি হয়।

ছক (১) **গাছপালার খাদ্য উপাদানসমূহ ও তাদের উৎস**

(উৎস) বাতাস ও জল থেকে	মাটি, সার ও অন্যান্য উৎস থেকে			
	প্রধান খাদ্য উপাদান	অপ্রধান খাদ্য-উপাদান	অণুখাদ্য উপাদান	
(১) কার্বন	(৪) নাইট্রোজেন	(৭) ক্যালসিয়াম	(১০) লোহা	* অতিরিক্ত সোডিয়াম,
(২) হাইড্রোজেন	(৫) ফসফরাস	(৮) ম্যাগনেসিয়াম	(১১) দস্তা	সিলিকন, কোবাল্ট,
(৩) অক্সিজেন	(৬) পটাসিয়াম	(৯) সালফার	(১২) তামা	ভেনাডিয়াম,
			(১৩) ম্যাঙ্গানিজ	আয়োডিন,
			(১৪) বোরন	বেরিয়ম,
			(১৫) মলিবডেনাম	স্ট্রনসিয়াম।
			(১৬) ক্লোরিন	

শস্য দেহের বাকি ১-৫ শতাংশ তৈরি হয় মূলত : ১৩টি প্রধান, অপ্রধান ও অনুখাদ্য খাদ্য উপাদান দিয়ে। যা শস্য মাটি থেকে সংগ্রহ করে। প্রধান লক্ষ্য হল জৈব ও অজৈব সারের মাধ্যমেই শস্যকে এই খাদ্য উপাদানের যোগান দেওয়া। প্রধানত শিল্পকারখানায় এইসব সার ব্যাপক ভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয়। গাছপালার প্রধান খাদ্য উপাদান, নাইট্রোজেন (N), ফসফেট (P_2O_5), ও পটাশ (K_2O) কে এক কথায় NPK বলা হয়।

উপরে উল্লেখিত ১৬ টি খাদ্য উপাদান ছাড়াও কোন কোন শস্যের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। এগুলি হল—সোডিয়াম, সিলিকন, কোবাল্ট, ভেনাডিয়াম, আয়োডিন, বেরিয়ম, ষ্টনসিয়াম ইত্যাদি। এগুলির কার্যকারিতা নিয়ে চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

অধ্যায় ২

রাসায়নিক সার পরিচিতি : নাইট্রোজেন ঘটিত সার :

উদ্ভিদ শরীরে নাইট্রোজেনের কাজ :

(১) নাইট্রোজেন উদ্ভিদের সর্বাঙ্গীণ বাড়-বৃদ্ধি ঘটায়। উদ্ভিদ বা গাছপালার পাতা ঘন সবুজ করে। (২) পাতায় ক্লোরোফিলের জন্য সবুজ রং হয়। ক্লোরোফিলের দুটি উপাদান—নাইট্রোজেন ও ম্যাগনেসিয়াম গাছ-পালা মাটি থেকে আহরণ করে। (৩) নাইট্রোজেন গাছের ডালপালা ও পাতার বৃদ্ধি করে, এগুলি গাছে ফুল ও ফল ফলাতে একান্তই অপরিহার্য। (৪) ফসফরাস, পটাসিয়াম ইত্যাদি উপাদানের কার্যকারিতা নাইট্রোজেন অনেকটা প্রভাবিত করে। (৫) প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য নাইট্রোজেন দরকার। (৬) ফসলে দানার সংখ্যা ও উৎপাদন নির্ভর করে এই প্রোটিনের মাত্রার উপর। এজন্য শস্যের বিশেষ করে দানা শস্যের ফলন অনেকটা নির্ভর করে নাইট্রোজেন সরবরাহের উপর। (৭) প্রয়োজনের বেশি নাইট্রোজেন প্রয়োগের ফলে শস্য বিশেষ করে দানাজাতীয় শস্য নুয়ে পড়তে পারে। এর ফলে ফসল পাকতে দেরি ও রোগ-পোকার আক্রমণ বাড়তে পারে। জমিতে নাইট্রোজেন যোগানের উপরই ফলন অনেকটা নির্ভরশীল।

নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন সার তৈরি :

বাতাসের মধ্যে বায়বীয় রূপে প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। গাছপালা বা শস্য সরাসরি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। বাতাসের এই নাইট্রোজেনকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য সার তৈরি করা হয়। বাতাসের নাইট্রোজেন ও নানা ধরণের কাঁচা মাল থেকে পাওয়া হাইড্রোজেন গ্যাস ১:৩ অনুপাতে বেশি তাপমাত্রায় উচ্চ চাপের মাঝে মিশ্রণ করলে এ্যামোনিয়া গ্যাস সংশ্লেসিত

হয়। মাত্রা হল : [$N_2+3H_2-2NH_3$] অবশ্য কিছু আয়রণ ক্যাটালিষ্ট এই সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

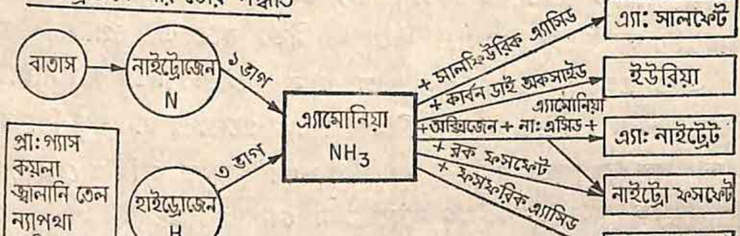
নাইট্রোজেন সার তৈরিতে এ্যামোনিয়া গ্যাসের ভূমিকা যথেষ্ট। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে এ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়। এই এ্যামোনিয়া গ্যাসের সঙ্গে নানা ধরণের এসিড, গ্যাস ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন সার তৈরি হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায় কিভাবে। ন্যাফথা প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, জ্বালানি তেল ও ভারি জল ইত্যাদি হাইড্রো-কারবন ঘটিত পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস মিলবে। তবে এইসব কাঁচামালের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়াগত তারতম্য অনুসারে এ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ পদ্ধতিরও কিছু পার্থক্য হয়ে থাকে।

এ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার হয় ৩ ভাবে। (১) অধিক চাপের মাধ্যমে তরল এ্যামোনিয়া গ্যাসরূপে। এ্যামোনিয়াম ফসফেট জাতীয় সার তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। (২) এ্যামোনিয়া গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করে। (৩) বিভিন্ন ধরণের নাইট্রোজেন ঘটিত সার এই গ্যাস থেকে তৈরি হয়।

ছক (২)

নাইট্রোজেন সার তৈরি পদ্ধতি



(১) এ্যামোনিয়াম সালফেট :

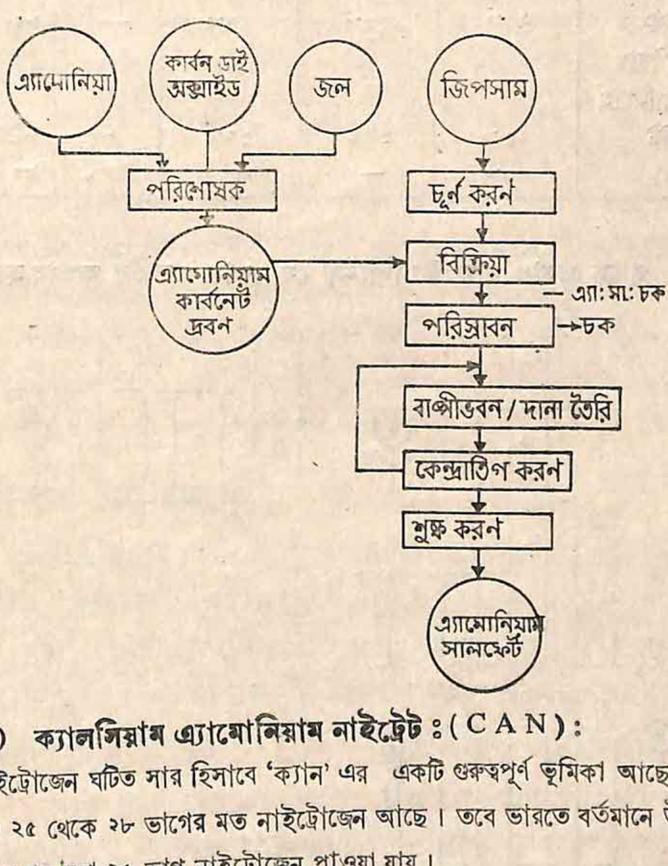
ভারতে তৈরি রাসায়নিক সারের মধ্যে এ্যামোনিয়াম সালফেট একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক সার। এতে শতকরা ২১ ভাগ নইট্রোজেন ও ২৪ ভাগ সালফার আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই সারটি প্রচুর পরিমাণে চাষে প্রয়োগ হত। এখনও চাষীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা আছে।

এই সার দেখতে অবিকল চিনির দানার মত। বস্তায় গুদামজাত করতে খুবই

সুবিধা তবে জল লাগলেই গলে যায়। জমির মাটি তৈরিতে শেষ চাষের সময় যেমন প্রাথমিক (মূল সার) (Basal dose) হিসাবে প্রয়োগ করা যায় তেমনি প্রধান প্রধান অনেক ফসলেই এ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়ে চাপান দেবারও রেয়াজ আছে। ফসফেট ও পটাশ ঘটিত সারের সঙ্গে এ্যামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে মিশ্রসার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

তবে এক নাগাড়ে বহুদিন ধরে এই সার ব্যবহারে মাটির অম্লত্ব বেড়ে যায়। তাতে মাটির ক্ষতি হতে পারে। ফলে ঐ জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যাবে। এ বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ছক (৩) জিপসাম পদ্ধতিতে এ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরির প্রবাহ চিত্র।



(২) ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট : (C A N) :

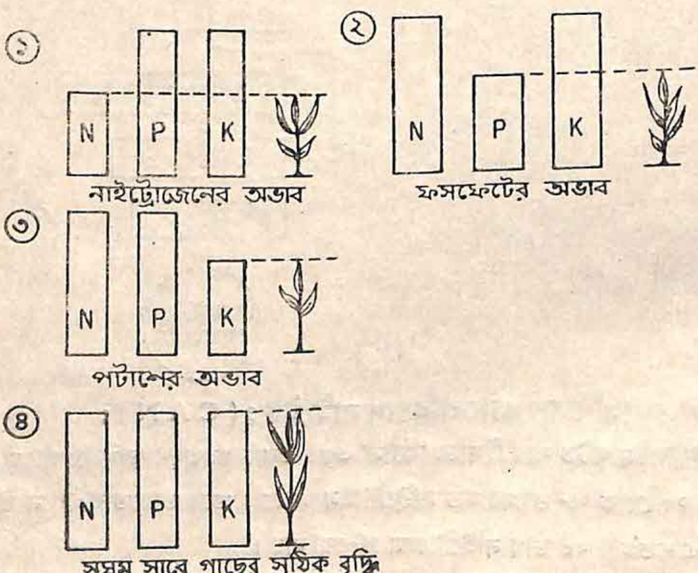
নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাবে 'ক্যান' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এতে শতকরা ২৫ থেকে ২৮ ভাগের মত নাইট্রোজেন আছে। তবে ভারতে বর্তমানে উৎপাদিত 'ক্যান' এ শতকরা ২৫ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

এছাড়া এতে যথেষ্ট ক্যালসিয়ামও আছে। এই সারে যে নাইট্রোজেন আছে তার

ছক (৪) **নাইট্রোজেন ঘটিত সারে নাইট্রোজেনের (শতকরা) পরিমাণ।**

সারের নাম	মোট নাইট্রোজেন	এ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন	নাইট্রেট নাইট্রোজেন	এ্যামাইড নাইট্রোজেন	সমান অম্লত্ব
(১) এ্যামোনিয়াম সালফেট	২০·৬	২০·৬	—	—	১১০
(২) এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	২৫·০	২৫·০	—	—	১২৮-১৪০
(৩) এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট	২৬·০	১৯·৫	৬·৫	—	৮৫
(৪) ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	২৫·০	১২৫	১২·৫	—	নিরপেক্ষ
(৫) ইউরিয়া	৪৬·০	—	—	৪৬·০	৮০

ছক (৫) **গাছে প্রধান খাদ্য উপাদানের যে কোন একটির অভাব হলে।**



অর্ধেক আছে এ্যামোনিয়ারূপে আর বাকি অর্ধেক নাইট্রেট রূপে। ক্যান থেকে সম পরিমাণ নাইট্রেট ও এ্যামোনিয়াম পদার্থ তৈরি হয়। কাদা বা জল দাঁড়ান জমিতে এইসার ব্যবহার করলে এর নাইট্রেট ভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই সার চাপান সার হিসাবে বা আউশ, গম ইত্যাদি ফসলে বোনার আগে ব্যবহার করা উচিত।

ক্যান' সার তৈরিতে কাঁচা মাল লাগে এ্যামেনিয়া, নাইট্রিক এ্যাসিড, চুনা পাথর অথবা ডলোমাইট এবং সোপ-স্টোন ইত্যাদি। এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নাইট্রেট নাইট্রোজেন গাছপালা বা ফসল প্রথম অবস্থায়ই নিতে পারে। কিন্তু এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন নাইট্রেট অবস্থায় প্রকৃত রূপান্তরিত হবার পর গাছপালা গ্রহণ করতে পারে। এই সার মাটির অম্লত্ব বাড়াতে দেয় না। কারণ এতে আছে ক্যালসিয়াম। অম্ল জমিতে এই সার ভাল কাজ করে। 'ক্যান' সারে ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকায় জমির ফলন শক্তি বাড়াতে পারে। দানাদার এই সার মজুত করা, নাড়াচাড়া করা সুবিধা এবং অপচয় কম হয়। অন্যান্য সারের সঙ্গে এই সার মেশানো যায়।

তবে অন্য সারের সঙ্গে এই সার মিশিয়ে শীঘ্রই তা জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তা না হলে এই মিশ্রণ তাড়াতাড়ি বাতাসের আদ্র'তা শুষে নেবে এবং সারের কার্য-কারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া জমিতে প্রয়োগ করার সময়ই ক্যান সারের ব্যাগ খোলা উচিত। আংশিক ব্যবহার করা সারের ব্যাগ আবার ভালোভাবে বন্ধ করে রাখতে হবে। ধান, গম, আলু, ভুট্টা, চীনাবাদাম, সরষে, আনারস, সবজি, পাট, লঙ্কা, তুঁতগাছ চাষে ক্যান সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ক্যন (CAN) সার তৈরি :

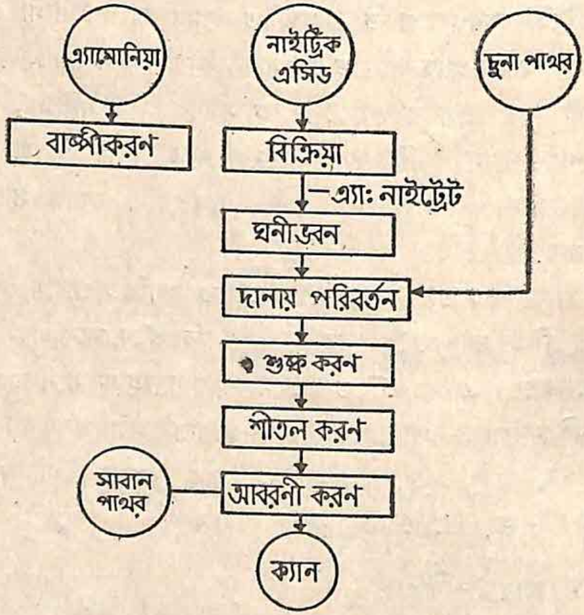
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা ক্যান (CAN) সার তৈরি করতে প্রয়োজন -এ্যামোনিয়া, নাইট্রিক এসিড ও চুনাপাথর।

এ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রিক এসিড তৈরি করা হয় প্রথমেই। এরপর এ্যামোনিয়া গ্যাস এবং বাতাস ১ : ১০ অনুপাতে মিশিয়ে গরম প্লাটিনাম রেডিয়াম পাতের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে সৃষ্ট নাইট্রাস অকসাইড জলে শোষণ করে নাইট্রিক এসিড তৈরি করা হয়।

এ্যামোনিয়া এবং নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি হয়। গলিত এ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে চুনাপাথর চূর্ণ মিশিয়ে ক্যান সার তৈরি করা হয়। এই সারকে শুকিয়ে, ছেকে ২.৪ মিলিমিটার আকারের মাপে দানাদার

করে তৈরি করা হয়। ক্যান সারে শতকরা ২৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেনের অর্ধেক এ্যামোনিয়াম এবং বাকি অর্ধেক নাইট্রেটরূপে থাকে। এছাড়া এতে ১০-২০ শতাংশ ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং ০-৭৫ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম অকসাইড থাকে।

ছক (৬) **ক্যালসিয়াম এ্যামেনিয়াম নাইট্রেট তৈরির প্রবাহ চিত্র।**



৩। এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড:

এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ এবং ক্লোরিন আছে শতকরা ৬৩-৬৬ ভাগ। দানাদার এই সারের রং সাদা হয়। জলে এই সার সহজেই গুলে যায় এবং এজন্য মাটি সহজেই এ সার গ্রহণ করতে পারে। খরিফ কালিন ধানেই এই সারের ব্যবহার বেশি। কারণ এইসব ফসল ক্লোরিন সহ্য করতে পারে না। তবে তামাক, আলু ইত্যাদি ফসলে এই সার প্রয়োগ করা উচিত না। এই সার প্রয়োগ করলে মাটির অম্লত্ব প্রচুর বেড়ে যায়। তুলনায় এ্যামোনিয়াম সালফেটের চেয়ে বেশিই বাড়ে।

৪। এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট (ASN) :

এই দ্বৈত লবণ সারটি প্রায় ১ : ৭ অংশ এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ১ অংশ এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এর মিশ্রণ। সাধারণ দানাদার সার এটি। এই সারে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ ২৬ ভাগ। এবং নাইট্রোজেনের ¾ (১৯.৫ শতাংশ) রয়েছে এ্যামোনিয়ারূপে এবং ¼ অংশ (৬. ৫ শতাংশ) নাইট্রেট নাইট্রোজেনরূপে। এতে শতকরা ১৫.১ ভাগ সালফারও আছে।

এই সারের বস্তা খুলে রাখলে বা দীর্ঘ দিন গুদামে রাখলে সহজেই সার গলে যায় ও দলা পাকিয়ে যায়। সুতরাং বস্তা খোলার পর শীঘ্র এই সার ব্যবহার করা দরকার অথবা সার খোলা অবস্থায় রাখা উচিত না। এই সার প্রয়োগে মাটিতে অম্লত্ব বাড়ে, তবে তা পরিমাণে এ্যামোনিয়াম সালফেটের চেয়ে অবশ্য কম। বীজ বোনার আগে, বোনার সময় এবং চাপান সার হিসাবে এই সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

৫। ইউরিয়া :

নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাবে ইউরিয়া সারের গুরুত্ব আমাদের দেশে সব চেয়ে বেশি। কঠিন পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত সারগুলির মধ্যে ইউরিয়াই প্রধান এবং উৎপাদনের পরিমাণও সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে রাসায়নিক সারের মাধ্যমে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহৃত হয় তার শতকরা ৭৩ ভাগ পাই আমরা ইউরিয়া থেকে। ভারতে ইউরিয়ার উৎপাদন শুরু হয় গত ১৯৫৯-৬০ সালে। এক বছরেই এই সারটি চাষীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

১৭০° থেকে ১৯০° সেঃ তাপমাত্রায় ১৬০ থেকে ২২০ বায়ুর চাপে এ্যামোনিয়া এবং কার্বনডাই অক্সাইড মিশ্রণ এ্যামোনিয়াম কার্বামেটে রূপান্তরিত হয়ে পরে ইউরিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

ছোট গোল শুকনো সাবু দানার মত এই সার ছড়াতে ও গুদামজাত করতে খুবই সুবিধা। এর রং সাদা, দানা ঝুরঝুরে এবং জমিতে সহজে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের দেশে উৎপাদিত অনাবৃত (uncoated) ইউরিয়ায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৪৬ শতাংশ। এবং আমদানিকৃত আবৃত (coated) ইউরিয়ায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ।

অন্যান্য সারের চেয়ে ইউরিয়ায় শতকরা হিসাবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে বলে জমিতে কম পরিমাণে দিতে হয়। এবং পরিবহণ, মজুত, ছড়াবার অনুষঙ্গিক খরচও কম পড়ে।

ইউরিয়া সহজেই জলে গুলে যায়। মাটিও সহজে এ সার গ্রহণ করতে পারে এবং মাটিতে কোন অবশিষ্ট থাকে না। অন্য নাইট্রোজেন ঘটিত সারের তুলনায় কম অম্লতা সম্পন্ন। এক কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগের জন্য যে পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োজন এবং তার জন্য মাটিতে যে অম্লতার সৃষ্টি হয় তা প্রশমিত করতে ১·৭ কেজি চুন (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) দরকার। এর আরো কয়েকটি বড় সুবিধা হল এ সার মাটিতে যেমন প্রয়োগ করা যায় তেমনি জলে গুলে গাছের পাতায় ছিটিয়েও প্রয়োগ করা যায়। আবার শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিশিয়েও ফসলে স্প্রে করা যায়।

এই সার প্রয়োগে কিছু অসুবিধাও আছে। ইউরিয়া ঠিক ভাবে, ঠিক পরিমাণে, ঠিক সময়ে প্রয়োগ না করলে এর অপচয় রোধ করা মুস্কিল। মাটিতে প্রয়োগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এর রূপান্তর ঘটতে থাকে। এজন্য এ সার ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতিটি অবলম্বন না করলে নাইট্রোজেনের অপচয় অনিবার্য।

মাটিতে ইউরিয়ার রূপান্তর ঃ

মাটিতে প্রয়োগের পর মাটির মধ্যের জলীয় অংশের সঙ্গে মিশ্রণে ইউরিয়া এ্যামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয় এবং পরে এই এ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। এই নাইট্রেটরূপেই অধিকাংশ শস্য মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। কারণ ইউরিয়া, ফসল মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এ্যামোনিয়াতে রূপান্তর ঘটে এনজাইমের ক্রিয়ায় (একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া) নাইট্রেটে পরিবর্তন ঘটায় ব্যাকটেরিয়া জীবাণু।

মাটির জলীয় অংশে গলে যাওয়ার পর ইউরিয়া প্রথমে এ্যামোনিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত হয়। তবে বেশিক্ষণ এভাবে স্থায়ী হয় না, খুব শীঘ্রই এটি পরিবর্তিত হয় এ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইডে। ইউরিয়া অতি শীঘ্র জলে গলে বলে ইউরিয়া প্রয়োগের পর সেচ দিলে বা বৃষ্টিপাত হলে ইউরিয়ার কিছু অংশ মাটির নিচে শস্যের শিকড়ের নাগালের বাইরে চলে গিয়ে অপচয় হতে পারে। তবে দেখা গেছে সাধারণ অবস্থায় এই অপচয় খুব একটা বেশি হয় না। কারণ ইউরিয়ার রূপান্তর দ্রুত ঘটে এবং ইউরিয়ার কাদামাটির কণিকা এবং জৈব পদার্থের কণিকার সংস্পর্শে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা আছে।

খুব বেশি আর্দ্র অবস্থায় মাটিতে অক্সিজেনের অভাব হলে এ্যামোনিয়াতে রূপান্তরের গতি ধীর হয়ে যেতে পারে। ক্ষার মাটিতে এবং যে মাটিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ বেশি সেখানে ইউরিয়ার এ্যামোনিয়াতে রূপান্তরে দেরি হয়।

দেখা গেছে অনুর্বর জমি থেকে উর্বর জমিতে, অম্ল, ক্ষার বা লবণাক্ত জমি থেকে

নিরপেক্ষ জমিতে, কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রায় এবং শুকনো মাটি থেকে ভিজে মাটিতে ইউরিয়ার রূপান্তর তাড়াতাড়ি ঘটে।

ইউরিয়ার অপচয় রোধ করতে :

ইউরিয়া এখন খুব দামী সার। এর অপচয় রোধ করার জন্য কয়েকটি ব্যাপারে চাষীদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যেমন : ১। উন্নত প্রয়োগ পদ্ধতি। ঠিক সময়ে, ঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করা দরকার। এছাড়া সারা মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ না করে ফসলের শিকড়ের প্রায় কাছে প্রয়োগ করা ২। একবারে সবটা পরিমাণ প্রয়োগ না করে ৪। বড় দফায় দফায় চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করা ৩। জলে গুলে পাতায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করা দানার আকারে প্রয়োগ করা। মাটির ঢেলা পাকিয়ে বা বিভিন্ন পদার্থে আবৃত করে প্রয়োগ করা যাতে কোন এক সময়ে অল্পপরিমাণে ইউরিয়া মাটির সরাসরি সংস্পর্শে আসে ৫। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যেগুলি ইউরিয়ার এ্যামোনিয়াতে রূপান্তর এবং নাইট্রেটে রূপান্তর বিলম্বিত করবে।

এই সারের কার্যকারিতা বাড়াতে ও সারের অপচয় রোধ করতে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ইউরিয়া রূপে এক বারেই গোটা সারটা না দিয়ে ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী ২/৩ বারে ভাগে ভাগে অল্প করে চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। এনিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। যেমন ধানে পাশকাঠি বৃদ্ধি, ফুলের মুকুল ও ফুল ধরার সময় এ সার দেওয়া। কিন্তু মূল সার অল্প পরিমাণে দিয়ে বাকি সার আরো ৩/৪ বারে ভাগ করে দেওয়া উচিত বলে কৃষি বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন। আবার বেশি ফলনের জন্য থোড় আসার সময় পর্যন্ত নাইট্রোজেন দেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেকেই। নাইট্রোজেন সার ৩ ভাগ করে ১ ভাগ মূলসার হিসাবে এবং ২ ভাগ চাপান সার হিসাবে দিতে বলা হয়। আন্তর্জাতিক ধান্য-গবেষণা কেন্দ্র ম্যানিলা বলেছে কাদা জমিতে সরাসরি বীজ বুনে ধান চাষ পদ্ধতিতে মূল সার না দিয়ে অর্ধেকটা সার বিয়ান ছাড়ার সময় এবং বাকি অর্ধেক থোড় আসার মুখে দেওয়া উচিত। এদের পরামর্শ নাবি জাতের ধানে ৪ বারে নাইট্রোজেন সার দিয়ে বেশি সুফল পাওয়া গেছে।

ইউরিয়া সার তৈরি :

অন্যান্য সারের চেয়ে ইউরিয়ায় শতকরা হিসাবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। এ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই অকসাইড গ্যাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ সার

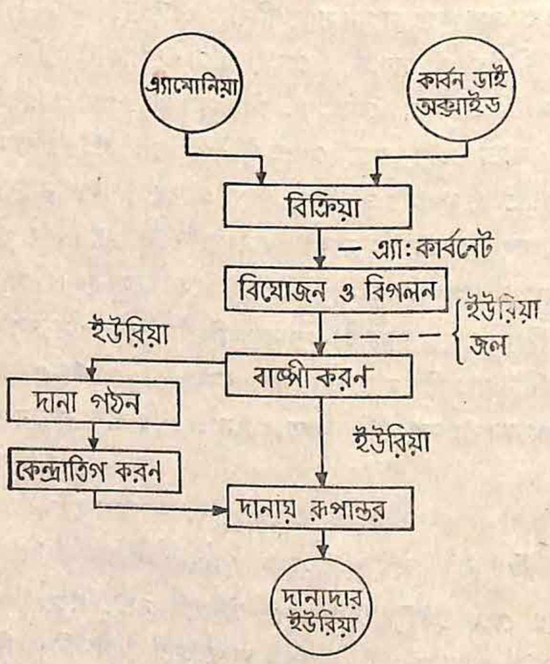
তৈরি হয়। ইবরিয়া তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এসব কাঁচা মাল এ্যামোনিয়া প্ল্যা'ন্ট থেকে পাওয়া যায়। এই বিক্রিয়া খুবই ক্ষয়কারক বলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি এ্যামোনিয়া ব্যবহার করা হয়। এবং ইউরিয়া প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি সব স্টেনলেস স্টিল বা অন্য কোন ক্ষয় রোধক ধাতু দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।

এ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বন ডাই অকসাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ১৮০° সে: তাপ-মাত্রায় এবং ২০০ কেজি/ বর্গ সেন্টি মিটার চাপে সংঘটিত হয়ে ইউরিয়া তৈরি হয়। সূত্র :
[$CO_2+2NH_3 \rightarrow NH_4\ COONH_2$; $NH_4\ COONH_2 \rightarrow NH_2\ CONH_2+H_2O$]

রিয়াকটর থেকে যখন ইউরিয়া বেরিয়ে আসে তখন একে শতকরা ৯৯.৫ ভাগ ঘনিভূত অবস্থায় আনা হয় এবং ১৮০ ফুট উঁচু টাওয়ারের উপর থেকে স্প্রে করা হয়। টাওয়ার থেকে পড়াকালীন অবস্থায় একে শক্ত ও চাহিদামত দানাদার করার জন্য ঠাণ্ডা করা হয়।

একবার ইউরিয়া তৈরির পর বাড়তি যেটুকু এ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই অকসাইড গ্যাস থাকে তা সরিয়ে আবার রিয়াকটরে দেওয়া হয় ইউরিয়া তৈরর জন্য। নানা ভাবে এটা করা যায়।

ছক (৭) **ইউরিয়া তৈরির প্রবাহ চিত্র।**



ইউরিয়ার অপচয় রোধ করতে আরো কিছু পরামর্শ ঃ

মাটির গভীরে ইউরিয়া প্রয়োগ করে নাইট্রোজেন অপচয় অনেক কমান যায়। মাটির উপরে ইউরিয়া ছড়িয়ে দিলে এ্যামোনিয়া গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে যায়। অক্সিজেনের অভাবে নাইট্রেট নাইট্রাস অক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাস হয়ে মাটি থেকে উড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। এই অপচয় বন্ধ করার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল উপরের মাটির ঠিক নিচের স্তরে ইউরিয়ার প্রয়োগ। মোটামুটি ৭.৫ সে: মি: (৩ ইঞ্চি মত) মাটির নিচে ইউরিয়া প্রয়োগ করে এ্যামোনিয়ারূপে ইউরিয়ার অপচয় কমান যায়। বৃষ্টি নির্ভর গম চাষে এইভাবে ইউরিয়া প্রয়োগে বেশি সুফল পাওয়া গেছে। রোয়া ধান চাষে মাটির ১০ সে: মিঃ (৪ ইঞ্চি) গভিরে ইউরিয়া প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিও আছে। যেমন ঃ

১। ইউরিয়ার ওজনের ৬ গুণ পরিমাণ ভিজে মাটির সঙ্গে ইউরিয়া মিশিয়ে ২/৩ দিন ধরে রেখে দেওয়া ২। কাদার গোলা তৈরি করে তার মধ্যে ইউরিয়া ভরে প্রয়োগ ৩। টুকরো কাগজের মোড়কে বা ব্রিকেটের আকারে প্রয়োগ। তবে এসবের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এতে মজুর খরচ বেড়ে যায়।

ইউরিয়ার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য আরো কিছু উপায় ঃ

১। বড় দানার ইউরিয়া ব্যবহার। এটা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যায় আছে।
২। আবৃত ইউরিয়া ঃ লাক্ষাচ্ছাদিত ইউরিয়া বাজারে আসছে। গন্ধক আবৃত ইউরিয়া নিয়েও পরীক্ষা চলছে। ৩। নিম, মহুয়া, করঞ্জার খোল মিশ্রিত ইউরিয়ার প্রয়োগে ইউরিয়ার অপচয় কমে। এনিয়েও চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আবৃত ইউরিয়া ঃ (Coated urea) ঃ

ইউরিয়া থেকে ধীরে ধীরে নাইট্রোজেন মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে এই সারের কার্যকারিতা বাড়াবার জন্য আবৃত ইউরিয়া যেমন—লাক্ষা আচ্ছাদিত ইউরিয়া, গন্ধক আচ্ছাদিত ইউরিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করে বিভিন্ন মাত্রায় সুফল পাওয়া গেছে। সাধারণ ইউরিয়া একাধিক বার প্রয়োগের তুলনায় এইসব আবৃত ইউরিয়া একবার প্রয়োগেই সুফল বেশি পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় ফলাফল বিচার করে দেখা গেছে যে ভুবনেশ্বর, কল্যাণী, পালমপুর, বারানসী এবং তিরুপতির ফলাফল বেশ উৎসাহ জনক এবং গড়ে হেক্টর প্রতি দানার হিসাবে ৩৪৪ কে. জি. ফলন পাওয়া গেছে।

এছাড়া আছে নিম বীজের নির্যাস মিশ্রিত ইউরিয়া, নিম বা করঞ্জ মিশ্রিত ইউরিয়া। নানা ক্ষেত্রে এইসব আবৃত সার, প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এসব আবৃত সার এখনও অনেকটা গবেষণা পর্যায়ে থাকায় চাষীদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়নি। তবে এসব আবৃত ইউরিয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলে কৃষি বিজ্ঞানীরা মনে করেন। লাক্ষা আচ্ছাদিত ইউরিয়া অতি সম্প্রতি কিছু বাজারে ছাড়া হয়েছে। এজন্য বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে—শেল্যাক এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউনসিল, ৫ম তলা, ১৪/১ বি, এজরা ষ্ট্রিট, কলকাতা-১ ঠিকানায়।

পাতায় ইউরিয়া প্রয়োগ : (Foliar Spray) : পাতায় জলে গোলা ইউরিয়া সার স্প্রে একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতি। ইউরিয়া সারের উচ্চ দ্রবণ ক্ষমতা, নিরপেক্ষ বিক্রিয়ার জন্য স্প্রে করে পাতার মাধ্যমে সার ব্যবহার একটি আদর্শ পদ্ধতি। এ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট বা এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এভাবে স্প্রে করে কোন সুফল পাওয়াতো যায়ইনি উপরন্তু এসব সার স্প্রে করার ফলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় পুষ্টি ব্যহত হয় এবং ফলনও কমে যায়। ইউরিয়া স্প্রে দ্রবণের সঙ্গে প্রায় সব রকম কীট নাশক ওষুধ ও অনু খাদ্যের মিশ্রণে সার ব্যবহারে চাষের খরচ কমিয়ে দেয়।

ইউরিয়া পাতায় স্প্রে করার পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ এবং ২ দিনের মধ্যে গাছ প্রায় সবটা সারই গ্রহণ করে। গাছ ১৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি বাড়ে। গাছে ইউরিয়া প্রয়োগের এটাই ভাল সময়। স্প্রে করার উত্তম সময় হল দিনের মধ্যে সকাল ও বিকাল বেলা। অর্থাৎ রোদের সময় বাদ দিয়ে। এবং গাছের ডগার নরম কচি পাতায় স্প্রে করলে গাছ বেশি গ্রহণ করতে পারে।

ফসল অনুযায়ী দ্রবণ :

ইউরিয়া দ্রবণের শক্তি ও মাত্রা নির্ভর করবে কি রকম ফসল তার উপর। এই দ্রবণের মান নির্ভর করে গাছের বয়স, প্রকৃতি ও কি ধরণের স্প্রে যন্ত্র ব্যবহার করবে তার উপর। সবজির মত কচি ও নরম পাতাযুক্ত শস্যে ইউরিয়ার হালকা দ্রবণ হওয়া উচিত। আবার শক্ত পাতাযুক্ত শস্যে দ্রবণের মাত্রা বেশি হলে ক্ষতি হয় না। সাধারণ যন্ত্রে স্প্রে করলে ইউরিয়া দ্রবণের মান বা শক্তি কখনই শতকরা ৬ ভাগের বেশি হওয়া উচিত না। কিন্তু সুপার ফাইন যন্ত্রে (মাইক্রোনেট-৩৫ স্প্রেয়ার) শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ পর্যন্ত ইউরিয়া দ্রবণ সার ব্যবহার করা যেতে পারে। এইভাবে সাধারণ যন্ত্রে বিঘাপ্রতি শস্য ক্ষেত্রে ৮০-১০০ লিটার ও মাইক্রোনেট যন্ত্রে ১৫-২০ লিটার ইউরিয়া দ্রবণ

প্রয়োজন। দ্রবণের সঙ্গে কিছুটা সাবান জল বা 'টিপল' মিশিয়ে দিলে গাছের পাতা এই দ্রবণকে সহজেই ধরে রাখতে পারে।

পাতার মাধ্যমে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে কয়েকটি ফসলে বেশ ভাল ফলন পাওয়া গেছে। তবে এ পদ্ধতি এখনও ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি।

আলু : আলুর পাতায় বিঘাপ্রতি ৫ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে মাটিতে ২০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগের সমান ফলন পাওয়া গেছে। আর একটি পরীক্ষায় বিঘা-প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে যেখানে ১৮ কুইণ্টাল ফলন হয়েছে সেখানে পাতায় দেড় কেজি মাত্র নাইট্রোজেন দিয়ে ২০ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া গেছে।

টমেটো : টমেটোর পাতায় ইউরিয়া সার ১.২৫% দ্রবণ হিসাবে প্রয়োগ করে ফলের মধ্যে চিনি ও 'সি' ভিটামিনের পরিমাণ বেশি হয়েছে। ফলগুলিও স্বাদে গুণে ভাল হয়েছে এবং মোট ফলনও বেশি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মোট নাইট্রোজেনের অর্ধেক পরিমাণ মাটিতে ও বাকি অর্ধেক পাতায় প্রয়োগ করা হয়েছিল।

ছক (৮) **আদর্শ ইউরিয়া দ্রবণ : দ্রবণের মান** (%)

শস্য	সাধারণ স্প্রেয়ারে	মাইক্রোনেট-৩৫ এ
(১) ধান, ভুট্টা	২—৪	১০—২০
(২) গম, জোয়ার, বাজরা	৩—৬	১০—৩০
(৩) পাট	১—২	১২—১৮
(৪) আখ	৪—৬	১৫—৩০
(৫) তুলা	১—২	১০—১৫
(৬) তৈলবীজ	১.৫—২.০	১—৫
(৭) ফল	০.২—১.০	৩—৫
(৮) ফুল, বাহারী গাছ লতা ও অন্যান্য	০.৫	১—২

বিঃ দ্রঃ (১) % ইউরিয়া দ্রবণ বলতে এক লিটার জলে ১০ গ্রাম ইউরিয়া সারের মিশ্রণ বোঝায়।

(২) এইভাবে সাধারণ স্প্রেয়ারে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬০০-৮০০ লিটার ইউরিয়া দ্রবণ এবং মাইক্রোনেট যন্ত্রে ১০০-১৫০ লিটার দ্রবণ প্রয়োজন।

বেগুন ঃ প্রতি বিঘা বেগুনের জমিতে ৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে এবং ৫ কেজি পাতায় ছিটিয়ে মাটিতে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগের সমান ফসল পাওয়া গেছে। দুর্বল, রুগ্ন গাছ শীঘ্র সবল হয়ে উঠেছে। সারের মোট খরচ কম হওয়ায় চাষীর মোট লাভ বেশি হয়েছে।

সরষে ঃ দিল্লিতে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের কৃষি খামারে একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সরষে ক্ষেতে প্রয়োজনীয় মোট নাইট্রোজেনের অর্ধেক ইউরিয়া পাতায় ছিটিয়ে পুরো নাইট্রোজেন মাটিতে প্রয়োগের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া গেছে। অন্য একটি পরীক্ষায় বিঘায় ৮ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে ও ৫ কেজি পাতায় প্রয়োগ করে ২-২ ½ কুইন্টাল সরষের ফলন পাওয়া গেছে।

এছাড়া চীনাবাদাম ও পাটের পাতায় ইউরিয়া গোলা জল স্প্রে করে খুব ভাল ফলন পাওয়া গেছে। কলার কাদিতে স্প্রে ও মোচা কেটে তার ডাঁটিতে ইউরিয়া বেঁধে দিয়ে কলার দেড়গুণ ফলন পাওয়া গেছে। ইউরিয়া প্রয়োগে কলার কাদি ও কলার আকার বড় হতে দেখা গেছে। তবে কলায় প্রয়োগের আগে ইউরিয়ার মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

অধ্যায় ৩

ফসফেটঘটিত সার ঃ

ফসফরাস একটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খাদ্য। বিজ্ঞানী ব্রানড ১৬৬৯ সালে মৌলিক ফসফরাস আবিষ্কার করেন এবং বিজ্ঞানী ন্যাস্টারনক এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এই ফসফরাস সার ছাড়া চাষীরা এখন চাষের কথা ভাবতেই পারেন না।

উদ্ভিদ শরীরে ফসফরাসের কাজ ঃ

১। ফসফরাস হল কোষের মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াসের একটি উপাদান। এটি কোষ ভাঙ্গে ও কোষ গঠন করে।

২। ফসফরাস ফসফোলিপিও, ফাইটিন, নিউক্লিও প্রোটিন, এনজাইম ও আরো অনেক যৌগ পদার্থের বর্তমান।

৩। এনজাইমের নানা প্রতিক্রিয়ায়ও ফসফরাসের অবদান যথেষ্ট।

৪। এনার্জি বদলের সব রকম কাজে ও গাছপালার সালোক সংশ্লেষ-এ ফসফরাসের ভূমিকা অনেক।

৫। ফসফরাস গাছের বিয়ান ছাড়তে সাহায্য করে ও তার ফলে গাছের কাণ্ডের সংখ্যাও বাড়ে।

৬। এই খাদ্য উপাদানটি গাছের কাণ্ড শক্ত করে, যার জন্য গাছ নুয়ে বা হেলে পড়ে না।

৭। ফসফরাসের জন্য উদ্ভিদ জলদি পরিণতি লাভ করে এবং দানা শস্যের দানা ও বিচালির অনুপাত বাড়াতে সাহায্য করে এবং মোট ফলনও তাতে বাড়ে।

৮। উদ্ভিদ দেহে নাইট্রোজেন ও পটাশ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে ফসফরাস।

৯। ফসফরাস উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়।

ফসফেটঘটিত সার তৈরি ঃ

সব ধরণের ফসফেট সার তৈরি হয় রক ফসফেট নামক এক প্রকার খনিজ পাথর থেকে। রক ফসফেটে ফসফেটের মোট পরিমাণ শতকরা ২০-৩৫ ভাগ থাকে। এর ক্যালসিয়াম ফসফেট অংশকে সার শিল্পে বলা হয় Bone Phosphate of Lime বা BPL. এই ধরণের রক ফসফেটে BPL এর পরিমাণ সাধারণতঃ থাকে শতকরা ৭৫ ভাগ। যে রক ফসফেটে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ কম এবং ফসফেট বেশি থাকে তা সার তৈরির জন্য বিশেষ উপযোগী।

ফসফেট সার তৈরির প্রধান কথা হল রক ফসফেট থেকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ক্যালসিয়াম অপসারণ করে নেওয়া। সম্পূর্ণ জলে দ্রবণীয় ফসফেট সার তৈরি করতে অবশ্য সবটা ক্যালসিয়াম অপসারণ করার প্রয়োজন নেই। লক্ষ্য রাখা দরকার যেন অধিকাংশ ক্যালসিয়াম ফসফরাসের সঙ্গে আবদ্ধ না থাকে।

রক ফসফেটকে এসিড দিয়ে দ্রবণীয় করার সময় ক্যালসিয়াম কী পরিমাণে দ্রবণীয় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে উৎপন্ন ফসফেট সারের জলে দ্রবণীয়তা। যদি সবটুকু ক্যালসিয়াম জিপসামরূপে অপসারিত করা হয়, তাহলে রক ফসফেট থেকে ফসফরিক এসিড তৈরি হবে।

ফসফেটের ব্যবহার ঃ

মানব দেহের হাড়ের মোট ওজনের ২০ ভাগ আসছে ফসফরাস থেকে। আর এটা পাওয়া যায় রোজকার খাদ্য থেকে। আর এই খাদ্য উৎপাদনে ফসফেট ঘটিত সারের গুরুত্বও অনেক। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ফসফেট ঘটিত সারের পরিমাণ খুবই কম। ভুল পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ ও গতানুগতিক চাষের ফলে মাটির মধ্যে ফসফেটের ভাগ ক্রমশঃ ক্ষয়ে চলছে।

ফসফেট ঘটিত সার গাছের শিকড় বৃদ্ধি বা বিয়ান ছাড়তেই শুধু সাহায্য করে না, ফুল-ফল ধারণের সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাদ, গন্ধ ও ফসলের গুণকেও উন্নত করে তোলে। মাটির উৎপাদিকা শক্তি নির্ভর করে তার অভ্যন্তরে বর্তমান নাইট্রোজেন ও ফসফেটের সমন্বয়ের উপর। এবং এজন্যই মাটিতে যে কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগের আগে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন রকম ফসফেটের পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

সিঙ্গল সুপার ফসফেট ঃ

বাজারে চাষীরা সুপার ফসফেট হিসাবে প্রধাণত এই সারই জমিতে ব্যবহার করে। প্রায় সব ফসলেই সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা হয়। সারের রং ধূসর বাদামি ও আকারে মিহি গুঁড়ো। এতে শতকরা ২৬ থেকে ৩০ ভাগ মনো-ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ৫০-৬০ ভাগ জিপসাম থাকে। সালফারের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ। জলে দ্রবণীয় ফসফেটের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ। এতে বেশ কিছু পরিমাণ অণুখাদ্যও আছে। চাপানের চেয়ে মূল সার হিসাবেই এই সারের কার্যকারিতা বেশি।

ছক নং (৯) **ফসফেটঘটিত সারে ফসফেটের (শতকরা) পরিমাণ**

সারের নাম	মোট ফসফেট	জলে দ্রবণীয় ফসফেট	অম্লে দ্রবণীয় প্রাপ্ত ফসফেট
(১) সিঙ্গল সুপার ফসফেট	—	১৬·০	—
(২) ট্রিপল সুপার ফসফেট	৪৬·০	৪২·৫	—
(৩) ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	—	—	৩৪·০
(৪) হাড়গুঁড়ো (কাঁচা)	২০·০	—	৮·০
(৫) হাড়গুঁড়ো (ভাপানো)	২২·০	—	১৬·০
(৬) বেসিক স্ল্যাগ	৩·০-৮·০	—	—
(৭) রক ফসফেট	৩০·০-৪০·০	—	—
(ক) উদয়পুর রক ফসফেট	৩০·০-৩২·০	—	—
(খ) মুসৌরী " "	১৬·০-২০·০	—	—
(গ) পুরুলিয়া " "	২৩·০-২৫·০	—	—

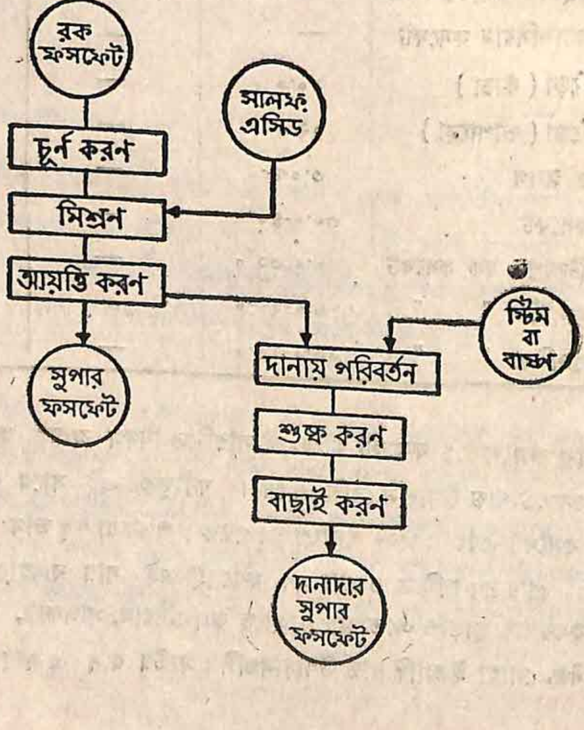
ট্রিপল সুপার ফসফেট ঃ ফসফেট ঘটিত এই সারটিতে সিঙ্গল সুপার ফসফেটের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ ফসফেট খাদ্য উপাদান বেশি থাকে। ঘনীভূত এই সারে ৪০-৪৫ শতাংশ জলে দ্রবণীয় ফসফেট এবং ১৭-২০ শতাংশ চুন থাকে। শতকরা ৪৬ ভাগ ফসফেট মোট থাকা উচিত। প্রায় সব জমিতে ও প্রায় সব ফসলেই এই সার ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনীয় ফসফরাস ছাড়াও এতে আরো আছে ক্যালসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ইত্যাদি খাদ্য উপাদানগুলি। মাটির রসে এ সার দ্রবণীয় এবং

গাছের কাছে গ্রহণযোগ্য। নাইট্রোজেন ও পটাশ ঘটিত সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

সিঙ্গল সুপার ফসফেট তৈরি ঃ

সার কারখানায় রক ফসফেট গুঁড়ো (১০০ মেশ) এবং ৫৫-৭০ শতাংশ শক্তির সালফিউরিক এসিড একটি ত্রিকোণ পাত্রে মিশ্রণ করা হয়! ফানেল বা চোঙা আকৃতি পাত্রের দুপাশ দিয়ে এসিড এবং জল মেশান হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাপ সৃষ্টি হয়। এখান থেকে দ্রবণ অন্য একটি পাত্রের এক প্রান্তে প্রবাহিত হয়ে খুব দ্রুত শক্ত হয়ে যায়। জমে যাওয়া দ্রবণকে একটি কনভেয়ারের মাধ্যমে পাত্রের অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ঘূর্ণীয়মান কাটা যন্ত্রে কেটে ছোট ছোট দানা তৈরি হয়। এই আধারে দ্রবণকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে রাখা হয়। এর পর তৈরি সুপার ফসফেট দানা ৩/৪ সপ্তাহ জমা করে প্যাকিং ও ব্যাগিং করে বাজারে ছাড়া যায়।

ছক নং (১০) **সিঙ্গল সুপার ফসফেট তৈরির প্রবাহ চিত্র।**



রক ফসফেট : এর রাসায়নিক পরিচয় ট্রাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট বা কার্বনেট এ্যাপেটাইট। প্রধান উপাদান ট্রাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট ছাড়াও এতে অল্প পরিমাণ কার্বনেট, ক্লোরিন, ফ্লুরিন, সালফেট ও হাইড্রোক্সাইডও আছে। রক ফসফেট একটি খনিজ পদার্থ এবং সব রকম ফসফেট ঘটিত সার তৈরিতে এটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতে কিছু উদ্ভিদ অণুখাদ্যও আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি।

এই সার অম্ল জমিতে প্রয়োগ করে ধান, চা, আঁখ, তুঁতে, আনারস, রবার, কফি চাষ করা হয়। খনি থেকে তুলে গুঁড়ো করে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এটি ফসফরাসের সব চেয়ে সস্তা উৎস। খুব ধীরে ধীরে এই সার ফসফরাস নিঃসৃত করে। অন্যান্য জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে এই সার প্রয়োগ করা যায়, গাছও তা সহজে গ্রহণ করতে পারে।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে রক ফসফেটে এইসব উপাদানগুলি বর্তমান। ১। ফসফেট ২০-২৪%, ২। ক্যালসিয়াম ৩৭-৪৫%, ৩। ম্যাগনেসিয়াম ৪-৭%, ৪। দস্তা ১০০-১৫০ পিপিএম ৫। তামা ১০-৫০ পিপিএম ৬। মলিবডেনাম ৫-৭৫ পিপিএম।

আমাদের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ রক ফসফেট বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তবে আমাদের দেশে রাজস্থানের উদয়পুর, মধ্য প্রদেশের ঝাবুয়া, উত্তর প্রদেশের মুসৌরী, বিহারের সিংভূম, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ায় প্রচুর রক ফসফেটর সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েকটি সার সংস্থা এ সার বস্তা করে চাষীদের কাছে বিক্রিও করছে। পশ্চিমবঙ্গে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেডিং করপোরেশন লিঃ (পঃ বঃ সরকারের একটি সংস্থা) ও পাইরাইটিজ ফসফেটস এ্যাণ্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (ভারত সরকারের একটি সংস্থা) এই সার তৈরির দুটি অন্যতম প্রধান সংস্থা।

রক ফসফেটকে গুঁড়ো করে বিশেষতঃ অম্ল জমিতে বেশি প্রয়োগ করা হয়। এ সার যত বেশি মিহি হবে ততই ভাল। রক ফসফেটের গুঁড়োর মাপ ৮০-১০০ মেশ হলে ফসফরাসের কার্যকারিতা ভাল হয়।

ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট : (ডি. সি. এফ) : রক ফসফেট ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণতঃ এই সার তৈরি হয়। অতি মিহি গুঁড়ো আকারে এই সারটি তৈরি হয়। এর রং সাদা। এই সারে অম্লে-দ্রবণীয় ফসফরাসের পরিমাণ শতকরা ৩৪ ভাগ। অম্ল মাটিতে এ সার প্রয়োগ খুব ফলপ্রদ এবং আখের মত দীর্ঘ মেয়াদী ফসলে ভাল কাজ দেয়। মিশ্র সার তৈরিতে এটি ভাল উপাদানের কাজ করে।

বেসিক স্ল্যাগ ঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের এটি একটি উপজাত পদার্থ। একে **টমাস** স্ল্যাগও বলা হয়। ইস্পাত তৈরির সময় লোহায় যে ফসফরাস, সিলিকন ইত্যাদি মিশে থাকে তা এই স্ল্যাগ হিসাবে আলাদা করে দেওয়া হয়। বিদেশে লৌহ আকরিকে শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ ফসফরাস থাকায় এই সার ফসফেট সার হিসাবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের বেসিক স্ল্যাগে ফসফরাসের মাত্রা শতকরা ৩—৮ ভাগ থাকে বলে সার হিসাবে খুব জনপ্রিয় না। এতে চুনের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় অম্ল জমিতে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে কিছু ফসফেটঘটিত অন্য সার মিশিয়ে নিলেই হল। দামে এ সার খুবই সস্তা। কিছু লোহার কারখানা অনেক সময় শুধুমাত্র পরিবহন খরচ দিলেই এ সার সরবরাহ করে থাকে।

বেসিক স্ল্যাগের গুঁড়ো যতো মিহি হবে সার হিসাবে তার কার্যকারিতা ততো বেশি হবে। এই সার গুঁড়োর শতকরা ৮০ ভাগ ১০০ মেশ ছাকনির মধ্য দিয়ে যেতে পারলে তা সার হিসাবে অধিক কার্যকরী হবে। তবে ৬০-৭০ মেশ আয়তন এর কার্যকারিতার পক্ষে যথেষ্ট।

আকরিক লোহা থেকে ইস্পাত তৈরির সময় সিলিকন, ফসফরাস ইত্যাদি উপাদান ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দূষিত পদার্থরূপে চুল্লির উপর দিকে উঠে আসে এবং তা নিচে ঢেলে সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা করে এটিকে ভাল করে গুঁড়ো করে বস্তা ভরে বাজারে বেসিক স্ল্যাগ নামে সার হিসাবে বিক্রি করা হয়। তবে প্রয়োজনীয় প্রচারের অভাবে এই সস্তা সারটির ব্যবহার ততটা প্রসার লাভ করেনি। তবে এ সারটির সম্ভাবনা প্রচুর।

অধ্যায় ৪

পটাশঘটিত সার ঃ

পটাশ এই ইংরেজী শব্দটির উৎপত্তি কাঠের ছাই থেকে পটাশিয়াম কার্বনেট নিষ্কাশনের এক পুরানো পদ্ধতি থেকে। পটাশ (Potash) শব্দের উৎপত্তির ব্যাপারটাও বেশ মজার। পট (Pot) ও ছাই (Ash) এই দুটি শব্দ যুক্ত হয়ে পটাশ হয়েছে। ছাই (Ash) জলে গুলে নিয়ে লোহার পাত্রে (Pot)-এ ফুটিয়ে শুকনো করে পরে কাঠের পাত্রে ঠাণ্ডা করে দানা বাঁধানো হোত। কাঠের ছাইয়ে পটাশের কাজ করে বলে অনেকে এখনও পটাশের পরিবর্তে কাঠের ছাই ব্যবহার করে।

মিউরেট অব পটাশের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) বিক্রিয়ার ফলে সালফেট অব পটাশ তৈরি হয়। এতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ পটাশিয়াম মনোক্সাইড থাকে। এটা প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ পটাশিয়াম সালফেটের সমান। আর আছে শতকরা ২·৫ ভাগ ক্লোরাইড। ভারতে মিউরেট অব পটাশ এবং সালফেট অব পটাশ সার বেশি ব্যবহৃত হয়। দেখতে সাদা, ধূসর, হলদেটে, লালচে ও তামাটে হয়।

সব পটাশ সারই জলে দ্রবণীয়, এজন্য গাছ খুব সহজেই পটাশ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ দেহে পটাশিয়াম সরবরাহের জন্য কয়েকটি ক্লোরিন সংবেদনশীল শস্য, যেমন—বীজ আলু, সবজি, লেবু ইত্যাদি বাদে প্রায় সব ফসলেই মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করা হয়।

উদ্ভিদ দেহে পটাশের ভূমিকা ঃ

১। পটাশ এনজাইমের ক্রিয়া সক্রিয় করে। পটাশ ছাড়া উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব থাকে না। ফসলে ৬০ টিরও বেশি এনজাইম ফসলের গৃহীত উদ্ভিদ খাদ্যগুলি দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ গঠনের কাজে সরাসরি সাহায্য করে ও সক্রিয় করে তোলে।

২। পটাশ উদ্ভিদ বৃদ্ধির ক্রিয়া ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রণ করে উদ্ভিদের শক্তি বাড়ায়, যার ফলে ধান, পাট, গম, আখ ও অন্যান্য ফসল দুর্বল হয়ে হেলে মাঠে শুয়ে পড়ে না। পটাশ গাছের কাণ্ড শক্ত করে গড়ে তোলে।

৩। পটাশ যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাসের সাহায্যে গাছপালার শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটায়।

ফলে উদ্ভিদ বা গাছপালা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। গাছের শিকড় ও মূল শীঘ্র মাটিতে ধরে যায় ও গাছ শীঘ্র বাড়ে।

৪। উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানগুলিকে পটাশ উদ্ভিদ দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে পরিবহন ও চলাচলে সাহায্য করে।

৫। পটাশ প্রয়োগে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও কীট পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। যেমন—(ক) ধানের গোড়া পচা, ঝলসা ও বাদামী দাগ রোগ। (খ) আলুর নাবি ধসা ও মধ্যের কালো দাগ পড়া রোগ। (গ) গমের ঝলসা ও পাউডারি মিলডিউ রোগ। (ঘ) তুলার ফুজারিয়াম উইল্ট। (ঙ) সূর্যমুখী পাতায় গুটি পোকার আক্রমণ ইত্যাদি।

৬। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগের কুফল অনেক পরিমাণে পটাশ দ্বারা শোধিত হয়।

৭। পটাশিয়াম গাছের পাতায় জলের বাষ্পীভবন নিয়ন্ত্রণ করে। তুষারপাত, অনাবৃষ্টি ও খরার সময় উদ্ভিদ দেহে জলের অপচয় রোধ করে ও খরা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়। এজন্য সেচবিহীন চাষে পটাশ প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন।

৮। পটাশ নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের কাজ করে।

৯। উদ্ভিদ বিপাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রিয়াগুলি পরিচালনের মাধ্যমে পটাশ নাইট্রোজেনের কুপ্রভাবকে প্রতিহত করে। সবজি, ফল ইত্যাদির পুষ্টি, গঠন, রং, গন্ধ ও স্বাদ উন্নত করে।

১০। পটাশ ক্লোরোফিল তৈরির কাজে লাগে।

১১। অম্ল জাতীয় ফল বিশেষ করে কমলা লেবু গাছে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সঙ্গে পটাশ দেবার ফলে কমলা লেবুর ওজন, স্বাদ ও ফলন সবই বাড়ে।

১২। সব রকম কন্দ ফসলের জন্য পটাশ অপরিহার্য।

পটাশের অভাব হলে ঃ

ফসলে পটাশের অভাব হলে প্রথমে পুরানো পাতার কিনারা ও ডগগুলি হলদে হয়। পটাশের অভাব খুব বেশি হলে পাতার গোড়া ও পাতার মাঝখানটাও হলদে হয়। পরে হলদে অংশটা জ্বলে যায় এবং প্রথমে ধূসর বাদামী অথবা লালচে হয়ে পাতা ঝরে পড়ে। পটাশের অভাবে বীজ ও ফলের আকার ছোট হয়। শেষের দিকে ধান ও গম গাছ নুয়ে পড়তে পারে। তুলায় রাষ্টি বা মরচে ধরা রোগ হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পটাশের অভাব হলেই গাছের বাড় ও ফলন দুইই কমে যায়।

গাছ কম পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করায় শিকড়ের বাড় ও বিস্তার কম হয়। ফলে গাছ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না, শুয়ে পড়ে ও পরে গাছ শুকিয়ে মরে যায়। প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকায় রোগ ও পোকার শিকার হয়ে পড়ে।

বিনিময়যোগ্য ও আটক এই দু অবস্থায় পটাশ মাটিতে থাকে। উদ্ভিত যে পটাশ সহজে গ্রহণ করতে পারে তাহল বিনিময়যোগ্য পটাশ। আর যে পটাশ উদ্ভিদের শিকড় গ্রহণ করতে পারে না, যা অন্যান্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক অবস্থায় থাকে তা হল আটক পটাশ। মাটিতে বিনিময়যোগ্য ও আটক পটাশের পরিমাণ হল যথাক্রমে শতকরা ৩ ভাগ ও ৯৭ ভাগ। বিনিময়যোগ্য পটাশ সহজে জলে মিশে যাওয়ায় উদ্ভিদ সহজেই শিকড়ের মাধ্যমে তা গ্রহণ করতে পারে। আর আটক পটাশ যৌগিক মিশ্রণে থাকায় গাছ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। আটক পটাশ আস্তে আস্তে বিনিময়যোগ্য পটাশে পরিণত হলে গাছও তা গ্রহণ করে। তবে তার গতি এত কম যে অধিক ফলনশীল শস্যের চাহিদার তুলনায় তা খুবই কম।

পটাশঘটিত সার তৈরি :

পটাশঘটিত খনিজ লবণ যেমন—কারনালাইট, কেইনাইট, ল্যাংগেবেইনাইট, সিলভাইট ইত্যাদি খনি থেকে তুলে শোধন করে বাজারে সার হিসাবে ছাড়া হয়। ভারতে মিউরেট অব পটাশ বা পটাশিয়াম ক্লোরাইড এই দু রকমে পটাশ সার পাওয়া যায়। তবে উন্নত দেশগুলিতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড রূপেই পটাশ সার বেশি পাওয়া যায়।

মিউরেট অব পটাশ বা পটাশিয়াম ক্লোরাইড :

এই সার প্রধানত সিলভাইট এবং কারনালাইট এ দু ধরণের খনিজ লবণ থেকে পাওয়া যায়। খনিজ পটাশিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড বা সালফেট ইত্যাদিও যুক্ত থাকে। এ জন্য পটাশ ঘটিত খনিজ লবণকে শোধন করে নিতে হয়। দুটি পদ্ধতিতে এই শোধন কাজ করা হয়।

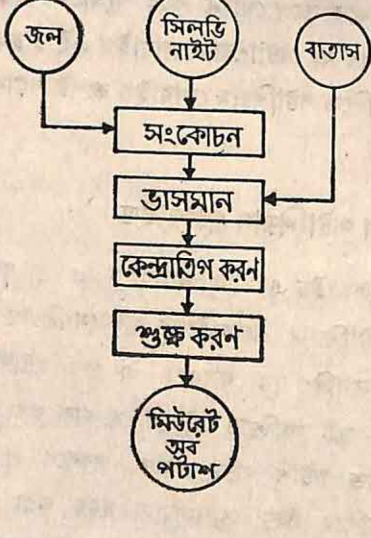
(ক) এই পদ্ধতিতে পটাশ ঘটিত খনিজ লবণকে সাধারণ লবণের (Brine Solution) সঙ্গে মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা হয়। এতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড সম্পূর্ণভাবে দ্রবণীয় হলেও সোডিয়াম ক্লোরাইড আদৌ দ্রবণীয় হবে না। পরে গরম পটাশিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণকে আলাদা করে ঠাণ্ডা করায় স্ফটিকাকারে এটি পাওয়া যায়।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পটাশঘটিত খনিজ লবণ থেকে বিভিন্ন দূষিত পদার্থ যান্ত্রিক উপায়ে আলাদা করা হয়। খনিজ লবণগুলিকে মিহি গুঁড়ো করা হয়। এই গুঁড়োকে সাধারণ লবণের ঘনীভূত দ্রবণের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পটাশিয়াম ক্লোরাইড বুদবুদের সঙ্গে মিশে এক সঙ্গে জমাট বাধে এবং মিশ্রণের উপরিভাগে ভেসে ওঠে। এই ভেসে ওঠা জমাট পদার্থকে উপর থেকে সরিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকনো, ঘনীভূত পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে গুঁড়ো করে ছাকনি দিয়ে বিভিন্ন মানে আনা হয় এবং প্যাকিং করে বাজারে পাঠান হয়।

পটাশিয়াম সালফেট ঃ

এটি পাওয়া যায় সাধারণতঃ কেইনাইট এবং ল্যাংগেবেইনাইট এ দু ধরণের খনিজ লবণ থেকে। এসব পদার্থের গুঁড়ো জলে দ্রবীভূত করে পটাশিয়াম সালফেট-রূপে স্ফটিকীকরণ করা হয়। এ ছাড়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং সালফিউরিক এ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ও এ সার তৈরি করা হয়।

ছক নং (১১) **ভাসমান পদ্ধতিতে পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরির প্রবাহচিত্র।**



পটাশের ব্যবহার ঃ

গাছ পালার বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস দরকার

তেমনি দরকার পটাশ। পটাশঘটিত সমস্ত সারই পটাশিয়াম লবণ। এ সার জলে সহজেই গলে যায় বলে গাছপালাও সহজে গ্রহণ করতে পারে। মিউরেট অব পটাশ (পটাশিয়াম ক্লোরাইড) এবং সালফেট অব পটাশ আমাদের দেশে পটাশঘটিত সার হিসাবে বেশি ব্যবহার হয়।

আমাদেয় দেশে পটাশের কোন খনি না থাকায় বিদেশ থেকে এনে এর প্রয়োজন মেটান হয়।

মিউরেট অফ পটাশ ঃ

বাজারে পটাশিয়াম ক্লোরাইড নামে এটি পরিচিত। খাঁটি দানাদার লবণ আকারে এটি পাওয়া যায়। নানা কারণে এর রং সাদা, তামাটে গোলাপী, লাল ও অন্য রংয়ের হতে পারে। এতে শতকরা ৪৮ থেকে ৬২ ভাগ পটাশ এবং প্রায় ৪৭ ভাগ ক্লোরাইড থাকে। সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে এতে কম পক্ষে ৫৮ শতাংশ পটাশ থাকা আবশ্যক। পটাশিয়াম ক্লোরাইড সম্পূর্ণভাবে জলে দ্রবণীয় পদার্থ।

এই সার প্রয়োগে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বাড়ে না। এজন্য প্রায় সব ফসলেই এই সার প্রয়োগ করা যায়। তবে কয়েকটি শাক-সবজি, ফল ও তামাক গাছে প্রয়োগে এদের ক্লোরিন অংশ ক্ষতি হতে পারে। মূল সার হিসাবে মাটি তৈরি ও বীজ বোনার সময় প্রয়োগ করাই ভাল। অবশ্য খুব হালকা মাটিতে এ সার দিয়ে চাপানও দেওয়া যেতে পারে। মিশ্র বা যৌগিক সার তৈরিতে শুষ্ক অবস্থায় এই সারের ব্যবহার চলে। তবে ইউরিয়ার সঙ্গে মিশ্রণে তৈরি সার দীর্ঘকাল গুদামে রাখলে জমাট বেঁধে যেতে পারে।

পটাশিয়াম সালফেট ঃ

সাদা লবণের মত দেখতে পটাশিয়াম সালফেটএ পটাশের ভাগ শতকরা ৪৫ থেকে ৫২ ভাগ। সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে এই সারে কমপক্ষে শতকরা ৪৮ ভাগ পটাশ থাকা উচিত। এই সার মাটির ক্ষার বা অম্লত্ব বাড়ায় না। পটাশিয়াম ক্লোরাইডের মতই সহজে দ্রবণীয় ও এর পটাশ খাদ্য উপাদানটি শস্যের পক্ষে সহজলভ্য। সব রকম জমিতে ব্যবহারযোগ্য এই সার মূল সার হিসাবে বা বীজ বোনার সময় প্রয়োগ করা যায়। তামাকের পক্ষে খুব উপযুক্ত সার এটি। কারণ এতে ক্লোরিন না থাকায় তামাকের উৎপাদন বাড়ায়। মিশ্রসারে অনায়াসেই এই সার মিশ্রণযোগ্য।

কয়েকটি ফসল ও পটাশের ব্যবহার ঃ

আখ ঃ আখ চাষে পটাশের প্রয়োজন একটু বেশি। এ চাষে অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যের তুলনায় পটাশ কম হলে আখের পাতায় ছিট-ছিট বাদামী দাগ পড়বে এবং পাতার কিনারাগুলি শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করবে এবং ডাঁটিতে লালচে রংয়ের দাগ দেখা দেবে। গড়ে ১০০ টনের আখের ফসল প্রতি হেক্টর জমি থেকে ৫৬৩ কেজি পটাশ অপসারণ করে। পটাশ আখে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও আখের রসের মান উন্নয়নের সহায়ক হয়।

পাট ঃ পাট চাষে বেশি মাত্রায় পটাশ প্রয়োগ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে জমি থেকে মোট নাইট্রোজেনের প্রায় আড়াইগুণ পটাশ গ্রহণ করে। এক হেক্টর পাটের জমি থেকে যেখানে ৬৩-৬৫ কেজি নাইট্রোজেন পাট ফসল গ্রহণ করে সেখানে পটাশ দিতে হবে ১৬০-১৬৩ কেজি। পশ্চিমবঙ্গের যে সব জেলায় যেমন বর্ধমান ও হুগলীর মাটিতে পটাশের পরিমাণ বেশি। এসব জেলায় হেক্টর প্রতি ২৮ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে ১·৬১ কুইন্টাল বেশি শুকনো আঁশ পাওয়া গেছে। ওড়িযার মাটিতে পটাশের ভাগ কম। সেখানে বেশি পটাশ প্রয়োগ করে পাটের বেশি ফলন পাওয়া গেছে।

কলা ঃ কলা চাষে পটাশ প্রয়োগে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেছে। কলা চাষে পটাশের প্রয়োজন খুবই বেশি। এ সার কলা গাছের শীঘ্র বৃদ্ধি ঘটায়, ফল পাকা ত্বরান্বিত করে। কাদি ও ছড়ায় কলার সংখ্যা বাড়ায়, ফলের আকার বড় করে, রসের অম্লতা ও মিষ্টতার অনুপাত উন্নত করে। নিবিড়ভাবে কলা চাষ করলে সেখানের মাটি থেকে পটাশ দ্রুত অপসৃত হবে। কাজেই কলার জমিতে পটাশ প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন।

নারকেল ঃ নারকেল চাষেও পটাশ খুব বেশি টানে। নাইট্রোজেন ও ফসফেটের তুলনায় ২/৩ গুণ পটাশ নারকেলের জমি গ্রহণ করে থাকে। অধিক ফলনশীল জাতের প্রতিটি বড় নারকেল গাছের জন্য ১ কেজি নাইট্রোজেন, আধ কেজি ফসফেট ও দেড় কেজি পটাশ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করে থাকেন। পটাশের অভাব হলে নারকেল গাছে নানা রোগের উৎপাত ঘটে।

বিঃ দ্রঃ কাঠের ছাই বা খাবার লবণ পটাশের বিকল্প না। কাঠের ছাই-এ পটাশের ভাগ শতকরা ২·৩ মাত্র। চাষের জমিতে লবণ প্রয়োগ করলে ক্ষতি হতে পারে, এমনকি নারকেল গাছে দিলেও।

ছক নং (১২) : **রাসায়নিক সারে উদ্ভিদ খাদ্যের (Nutrients) শতকরা পরিমাণ।**

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)
(১) (ক) এ্যাঃ সালফেট (রাজা)	২০	—	—
(খ) ঐ রঙিন গুঁড়ো	২০	—	—
(২) (ক) ইউরিয়া ৪৬%	৪৬	—	—
(খ) ইউরিয়া ৪৫%	৪৫	—	—
(৩) ক্যালসিয়াম এ্যাঃ নাইট্রেট (CAN-সোনা) ২৫%	২৬	—	—
ঐ ২৫%	২৫	—	—
(৪) অ্যাঃ সালফেট নাইট্রেট	২৬	—	—
(৫) ডাই এ্যাঃ ফসফেট (DAP)	১৮	৪৬	—
(৬) (ক) সিঙ্গল সুপার ফসফেট	—	১৬	—
(খ) ট্রিপল " " (ত্রিবেণী)	—	৪৬	—
(৭) মনো এ্যাঃ ফসফেট	১১	৪৮	—
(৮) নাইট্রোফসফেট (যৌগিক)			
(ক) সুষম : ২০ : ২০ : ০ (সুফলা)	২০	২০	—
নাইট্রো ফসফেট পটাশ			
(খ) সুষম ১৮ : ১৮ : ৯ (গ্রেড ১ সুফলা)	১৮	১৮	৯
(গ) সুষম ১৫ : ১৫ : ১৫ গ্রেড ২ (সুফলা)	১৫	১৫	১৫
(৯) (ক) মিউরেট অফ পটাশ অথবা (খ) পটাশিয়াম ক্লোরাইড,	—	—	৬০
(গ) সালফেট অব পটাশ	—	—	৫০

(১০) এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	২৫	—	—
(১১) বেসিক স্ল্যাগ	—	৩-৮	—
(১২) রক ফসফেট			
(ক) মুসৌরী ফস	—	২০-২৪	—
(খ) পুরুলিয়া „	—	২৩-২৫	—
(গ) উদয়পুর „	—	৩০-৩২	—

মিশ্রসার (যৌগিক) ঃ

(১) স্টেরামিল (ব্ল্যাক লেবেল)	৭	১০	৫
(২) স্টেরামিল (স্পেশাল)	৫	৫	—
(৩) স্টেরামিল প্ল্যান্টিং (মিকচার)	৭	১০	—
(৪) অর্গামিল (১)	৭	১০	—
(৫) অর্গামিল (২)	৬	৪	২
(৬) মিকচার গ্রেড-১	৮	৮	৮
(৭) ইউরিয়া এ্যাঃ ফসফেট (গ্রোমোর)	২৮	২৮	—
(৮) এ্যাঃ ফসফেট সালফেট (APS)			
গ্রেড-১ (প্যারামফস)	১৬	২০	—
গ্রেড-২ „	২০	২০	—
গ্রেড-৩ „	১৯.৫	১৯.৫	—
(৯) NPK যৌগিক সার			
ইফকো গ্রেড-১ (IFFCO)	১০	২৬	২৬
ইফকো গ্রেড-২ (IFFCO)	১২	৩২	১৬

ছক নং (১৩) **১ কেজি উদ্ভিদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার**

নাইট্রোজেন		**পটাশ**	
ইউরিয়া	২'২০ কেজি		
ক্যাঃ এ্যাঃ নাইট্রেট (CAN)	৪ "	মিউরেট অব পটাশ	১'৬৬০ কেজি
এ্যাঃ সালফেট (রাজা)	৫ "	পটাশিয়াম সালফেট	২'০ "
এ্যাঃ ক্লোরাইড	৪ "		
এ্যাঃ সালফেট নাইট্রেট	৪ "	কাঠের ছাই	২'০ "
ফসফেট ঃ			
সুপার ফসফেট (সিঙ্গল)	৬ ২৫ "		
সুপার ফসফেট (ট্রিপল)	২'২০ "		
বেসিক স্ল্যাগ	১২'৫ "		
হাড় গুঁড়া ও ১৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন	৫'০০ "		
রক ফসফেট ঃ			
পুরুলিয়া ফস	৪-৫ "		
মুসৌরী ফস	৪-৫ "		
উদয়পুর ফস	৩-৩'৩৩ "		

যৌগিক সার ঃ

সুফলা ২০ : ২০ : ০=৫ কেজি=১ কেজি নাইট্রোজেন ও ১ কেজি ফসফেট।

সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫=৬'৬৬ কেজি=১ কেজি নাইট্রোজেন ১ কেজি ফসফেট ও ১ কেজি পটাশ।

ডি-এ-পি ১৮ : ৪৬ : ০=২'২০ কেজি=০'৪ কেজি নাট্রোজেন ও ১ কেজি ফসফেট।

গ্রোমোর ২৮ : ২৮ : ০=৩'৫৭ কেজি=১ কেজি নাইট্রোজেন ও ১ কেজি ফসফেট।

ইফকো গ্রেড-১ (১০ : ২৬ : ২৬)=১০ কেজি=১ কেজি নাইট্রোজেন, ২'৬ কেজি ফসফেট ও ২'৬ কেজি পটাশ।

ইফকো গ্রেড-২ (১২ : ৩২ : ১৬)=৮'৩৩ কেজি=১ কেজি নাইট্রোজেন, ২'৬৬ কেজি ফসফেট ও ১'৩৩ কেজি পটাশ।

ছক নং (১৪) **বিভিন্ন শাক সবজিতে সারের চাহিদা**

সবজির নাম	একর প্রতি কেজিতে		
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট P_2O_5	পটাশ K_2O
শালগম, বীট, গাজর, টম্যাটো, লংকা, রসুন, ঢ্যাড়স ইত্যাদি	৪০	২০	২০
ফুলকপি (জলদি, নাবি, মাঝারি) বাঁধাকপি (জলদি, মাঝারি), বেগুন, কচু, ওল ইত্যাদি	৬০	৩-	৩০
ওলকপি, মূলা, পালং, লেটুস, মেথি, পুঁই, নটে, কাটোয়া ডাঁটা ইত্যাদি	৩০	১৫	১৫
পটল, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, করলা, ঝিঙ্গা, শশা, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি	২৪	১২	১২
কাঁকুড়, খরবুজা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি	১২	০	০
কড়াইশুঁটি, বরবটি, সীম, ফ্রেঞ্চবীন ইত্যাদি শুঁটি জাতায় সবজি	১৫	২০	২০
মিষ্টি আলু	২০	২০	২০
চাল কুমড়া	১৫	০	০
আলু	৬০-৮০	৪০-৬০	৪০-৬০

ছক নং (১৫) **বিভিন্ন ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষে সারের চাহিদা (একরে কেজিতে)**

মুগ, কলাই ইত্যাদি	৪	১৬	০
মুসুর, ছোলা, মটর, অড়হর ইত্যাদি	৮	১৬	০
সয়াবীন	১৫	২৫	২০

ছক নং (১৫) : **বিভিন্ন ডাল-শস্য ও তেলবীজ চাষে সারের চাহিদা**

(একরে কেজিতে)

চীনাবাদাম	৬	১২	১৮
সরষে (সেচ এলাকা)	২০	১০	১০
সরষে (অসেচ এলাকা)	১৬	৮	৮
সূর্যমুখী	২৪	১৬	১৬
তিল	১০	১০	১০
তুলা	১৫	১৫	১৫

ছক নং (১৬) : **ধান, পাট, গম ইত্যাদি শস্যে সারের চাহিদা**

ফসলের নাম	একরপ্রতি কেজিতে		
	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ K_2O
ধান :			
আমন, আউশ (ছিটিয়ে বোনো)	২০	১০	১০
আউশ (দেশী উন্নত)	১০	১০	১০
আউশ (রোয়া) } আমন (১২০-১৫৫)	২৪	১২	১২
আমন (অধিক ফলনশীল)	১৬	৮	৮
বোরো (অধিক ফলনী), গম (সেচ এলাকা)—	৪০	২০	২০
বোরো (মাঝারি)	৪৮	২৪	২৪
পাট :			
মিঠা বা তোষা পাট	১০-১৬	৫-৮	৫-৮
তিতা বা গুটি পাট	১৫-২৫	৭-১২	৭-১২
গম :			
গম (অসেচ এলাকা)	৮	৮	৮
গম (সেচ এলাকা)	৪০	২০	২০
আখ	৬৪	২৪	২৪
ভূট্টা	৪৫	৩০	২০

ছক নং (১৭) : **মশলা চাষে সারের চাহিদা (একরে কেজিতে)**

আদা	—	২৪	৩০
জিরা (শাদা)	৪ (চাপান)	০	০
কালজিরা	৫	৫	১৫
ধনে	৮	৮	৮
মৌরী	৮	১২	০
রাই সরষে (অসেচ এলাকা)	১৬	৮	৮

অধ্যায় ৫

অপ্রধান উদ্ভিদখাদ্য উপাদান ঃ

(১) ক্যালসিয়াম ঃ

উদ্ভিদখাদ্য তালিকায় ক্যালসিয়াম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গাছের অপ্রধান খাদ্য উপাদান হিসাবে এর স্থান প্রথম না হলেও দ্বিতীয় অবশ্যই। মাটির স্বভাব বিশেষ করে মাটির অম্লতা দূর করার জন্য এর প্রয়োজন খুব বেশি। বেশি রাসায়নিক সারের সঙ্গে আনুপাতিক হারে জৈব সার না দিলেই মাটিতে অম্লের ভাগ বেড়ে যেতে পারে। মাটিকে শীতল ও মিষ্ট অবস্থায় রাখার জন্য মাটিতে প্রয়োজন অনুপাতে ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করা উচিত। তবে কোন মাটিতে কতটা পরিমাণ ক্যালসিয়াম দেওয়া উচিত তা মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে করা দরকার।

ক্যালসিয়াম প্রয়োজন কেন ? ঃ

মাটির ভৌতধর্মকে রক্ষা করতে এবং মাটিতে যেসব জীবাণু বা ব্যাকৃটেরিয়া আছে তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োগ অনেকসময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পেলে গাছপালার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। গাছপালার কোষ গঠনে সহায়ক হয়। মাটির ব্যাকৃটেরিয়াল তৎপরতা বাড়িয়ে শিকড় প্রসারে সাহায্য করে। জৈব নাইট্রোজেনকে ব্যাকৃটিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। এছাড়া নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং গাছের ভিতর ফসফরিক প্রভৃতি এ্যাসিডের অম্লত্ব নিবারণ করে।

ক্যালসিয়ামের অভাব হলে ঃ

ক্যালসিয়ামের অভাব হলে গাছের স্বাভাবিক বাড়-বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মূল বা শিকড় বাড়তে চায় না, পাতার রং পালটে যায় ও পাতা ঝরে পড়ে। পাতায় ছোপ-ছোপ দাগ পড়ে। নতুন পাতা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। ফুল ও ফলের কুঁড়ি

অসময়ে ঝরে পড়ে ও কাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। শুঁটিজাতীয় ফসল বাড়তে চায় না।

(২) ম্যাগনেসিয়াম :

অপ্রধান উদ্ভিদখাদ্য উপাদান হিসাবে ম্যাগনেসিয়ামের গুরুত্ব ও এর প্রয়োগ দিনদিন বাড়ছে। মাটির ভৌতধর্ম ঠিক রাখতে ও মাটির অম্লত্ব কমাবার জন্য ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন। পাতার সবুজ কণিকা বাড়াতে ম্যাগনেসিয়াম একটি অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদানটি গাছের পাতায় তেলতেলে ভাব আনতেও সাহায্য করে।

ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে পাতার রং হলুদ হয়ে যায়। অভাব বেশি হলে পাতা ঝরে পড়ে। কখনও বা পাতা কুঁকড়ে গুটিয়ে যায়।

(৩) সালফার বা গন্ধক :

গাছপালার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ১৬ টি খাদ্য উপাদানের মধ্যে সালফার একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য মৌল। এই উদ্ভিদখাদ্যটি প্রায় সব ফসলেই দরকার, তবে ধান, গম, আলু, চীনা বাদাম, বাঁধাকপি, শালগম, রসুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি ফসলের ভাল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। গাছের এই খাদ্য উপাদানটি গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের প্রায় সম পর্যায়ে পড়ে। একই জমিতে নিবিড় ও বহু ফসলী চাষের ফলে জমি থেকে সালফারের পরিমাণ কমে যায়। চুইয়ে যাওয়া, বাষ্পীভূত হওয়া এবং গাছের খাদ্য কণিকা হিসাবে সালফার গ্রহণের ফলে জমি থেকে সালফারের ক্ষয় হয়।

সালফারের প্রয়োজন কেন ? :

গাছের প্রোটিন তৈরিতে প্রধান খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন ও ফসফেটের সঙ্গে সমানভাবে সালফার (গন্ধক) 'খাদ্য কণিকার প্রয়োজন। উদ্ভিদ কোষের মেটাবলিজম ও এনজাইমিক (Metabolism and enzymic process) প্রক্রিয়ায় এই খাদ্য কণিকাটি সরাসরি সাহায্য করে। এছাড়া সালফার কতকগুলি জৈবিক পদার্থ যেমন—থাই-ইউরিয়া, থায়ামিন, গ্লুটাথিয়ন, বায়োটিন, প্ল্যাণ্ট রেগুলেটারস তৈরিতে সাহায্য করে। সালফার ও অন্যান্য খাদ্য কণিকার মিশ্রিত প্রক্রিয়ায় ফসলের স্বাদ, গন্ধ ও অন্যান্য গুণ বাড়ে।

উদ্ভিদের পুষ্টি যোগাতে ও ছত্রাক নাশ করতে সালফারের ভূমিকা যথেষ্ট। এর অভাবে গাছের পাতায় ক্লোরোসিস বা হলুদ রোগ দেখা যায়, গাছের বাড় কমে যায়

ডালপালা সরু হয়ে যায়, ফল ও বীজ পাকতেও বেশি সময় লাগে। গাছ বেঁটে হয়ে যায়। এছাড়া নাইট্রোজেনের অভাবে গাছে যে সব লক্ষণগুলি দেখা যায়, সালফারের অভাবেও ঠিক সেইসব অভাব দেখা যায়।

সালফারের কার্যকারিতা ঃ

পরীক্ষায় দেখা গেছে বেলে, কাঁকুরে, লাল ও পলি মাটি এলাকায় গ্রহণযোগ্য সালফারের ঘাটতি আছে। ৩টি প্রধান উদ্ভিদখাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০০ কে, জি সালফার প্রয়োগ করে চীনা বাদামের উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেশি পাওয়া গেছে। (চোপরা ও কানোয়ার ১৯৬৬)। শুধু প্রধান উদ্ভিদখাদ্য উপাদান প্রয়োগ করে যেখানে ৯,৪৫০ কেজি আলুর ফলন পাওয়া গেছে সেখানে হেক্টরে ঐ সব সারের সঙ্গে আরো ২৫ কেজি সালফার প্রয়োগ করে আলুর ফলন পাওয়া গেছে ১২,০৬০ কেজি অর্থাৎ ২,৬১০ কেজি বেশি ফলন (ঔলাখ্ ও পরিসজা ১৯৭৯)। এটি শতকরা হিসাবে ২৮ ভাগ বাড়তি ফলন।

সালফারের ব্যবহার ঃ

ভূ স্তরের মাটিতে শতকরা প্রায় ০·০৬ ভাগ সালফার আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সালফাইডস, সালফেট, নাইট্রোজেন ও কার্বনঘটিত যৌগ হিসাবে এই সালফার থাকে। বায়ুমণ্ডল থেকেও মাটি কিছু সালফার গ্রহণ করে। জিপসাম, এ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফেট ইত্যাদির মাধ্যমে সালফারের প্রয়োগ করা যায়। সালফারের পরিমাণ নির্ভর করবে ফসলের প্রজাতি, মাটির অবস্থা, ফসলের নিবিড়তা, বৃষ্টি-পাত, সেচ ও কি ধরণের কতটা কীটনাশক ওষুধ ফসলে প্রয়োগ করা হয়েছে তার উপর। তবে সালফার প্রয়োগের আগে মাটি পরীক্ষা করে নেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়।

অধ্যায় ৬

অণুখাদ্য ঃ

আগেই বলা হয়েছে ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও আশানুরূপ ফলনের জন্য মোট ২০ টি খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন। প্রধান ও অপ্রধান ৯টি খাদ্য উৎপাদান ছাড়াও উদ্ভিদের আরো ১১ টি অণুখাদ্য প্রয়োজন। এগুলি হল—লোহা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, বোরণ, মলিবডেনাম, ক্লোরিন, সোডিয়াম, সিলিকন, কোবাল্ট ও ভেনাডিয়াম'।

এইসব অণুখাদ্যের চাহিদা উদ্ভিদ সাধারণতঃ মাটি থেকেই সংগ্রহ করে। ইদানিং অধিক ফলনশীল জাতের চাষ এবং একই জমিতে একাধিক ফসলের চাষ শুরু হওয়ায় জমিতে অণুখাদ্যের ঘাটতি শুরু হয়েছে। এছাড়া জমিতে অধিক পরিমাণে যৌগিক সার, ফসফেটঘটিত সার ও সাধারণ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগের ফলে মাটিতে অণুখাদ্যের সহজলভ্যতা কমে যায়। প্রধান খাদ্যউপাদান গুলির অভাবে জমিতে যেমন রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়, তেমনি অণুখাদ্যের অভাবে অণুঘটিত সার প্রয়োগ করা দরকার। তবে অনুঘটিত সার প্রয়োগের আগে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রয়োগ করা উচিত।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের দেশের চাষের জমিতে দস্তা, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় বোরণের অভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে সব, জমিতে দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে, বা যে সব মাটিতে জৈব পদার্থের ভাগ কম সেখানে এবং বেলে মাটি এলাকায় অণুখাদ্যের অভাব বেশি করে দেখা যায়।

অণুখাদ্য প্রয়োগ ঃ

অণুখাদ্য সরাসরি মাটিতে বা সারের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা জলে মিশিয়ে শস্যের পাতায় স্প্রে করে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োগের সাধারণ মাত্রা নিচের ছকে দেওয়া হল।

এ ব্যাপারে একটা কথা চাষীদের মনে রাখা দরকার যে অণুখাদ্যের মাত্রা, সময়, প্রয়োগের পদ্ধতি এবং কোন শস্যে কোন অণুসার প্রয়োগ করা উচিত ইত্যাদির জন্য

কাছাকাছি কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় বা কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রয়োগ করা উচিত না। একটু ভুল হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অণুখাদ্যের প্রয়োজন কেন ?ঃ

প্রায় 'সবরকম মাটিতেই অণুখ্যাদ্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। পাঞ্জাবে এইসব মাটিতে জিঙ্ক সালফেট ব্যবহার করে গমের ফলন বেশি পাওয়া গেছে। অনেক সময় জিঙ্ক অভাবে লেবু গাছের কিছু ক্লোরোসিস রোগ জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগে দমন করা যায়। পশ্চিম বাংলার কোন কোন মাটিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষে জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করে ভাল কাজ হয়েছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সবজি চাষেও মাটিতে জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ প্রয়োগে বেশি উৎপাদন পাওয়া গেছে।

ছক নং (১৮)ঃ **শস্যে অণুখাদ্য প্রয়োগমাত্রা**

অণুখাদ্যের নাম	সাধারণ উপাদান ও হেক্টরপ্রতি প্রয়োগ মাত্রা	পাতায় স্প্রের মাধ্যমে প্রয়োগ মাত্রা / হেক্টপ্রতি
(১) লোহা	ফেরাস সালফেট ১০-২০ কেজি	৫-৭ কেজি, ২০০ গ্যালন জলে গুলে অথবা ০.৪% ফেরাস সালফেট + ০.২% লাইম।
(২) দস্তা	জিঙ্ক সালফেট ও জিঙ্ক অক্সাইড ১০-৪০ কেজি	২-২০ কেজি, ২০০ গ্যালন জলে গুলে অথবা ০.৫% জিঙ্ক সালফেট + ০.২৫% লাইম।
(৩) ম্যাঙ্গানিজ	ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ১০-৫০ কেজি	৪-৮ কেজি ২০০ গ্যালন জলে গুলে অথবা ০.৬% ম্যাঙ্গানিজ সালফেট + ০.২৫% লাইম।
(৪) তামা	কপার সালফেট বা তুঁতে ২-৫০ কেজি	০.৫-১০ কেজি ২০০ গ্যালন জলে গুলে অথবা ০.১% কপার সালফেট + ০.০৫% লাইম।
(৫) বোরণ	বোরাক্স ৫-২০ কেজি	১-৫ কেজি ১০০ গ্যালন জলে গুলে অথবা ০.২% বোরাক্স।
(৬) মলিবডেনাম	সোডিয়াম মলিবডেট বা এ্যাঃ মলিব ডেট ০.৬-১.০ কেজি	০.০১৫-০.৫ কেজি ১০০-২০০ গ্যালন জলে গুলে।

মাটিতে অণুখাদ্য ব্যবহারে গাছের অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। গাছের পাতায় ক্লোরোফিলের মাত্রা বাড়ে এবং পাতা ঘন সবুজ হয়। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জনন প্রক্রিয়া ক্ষমতা বাড়ে। ফলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এইসব অণুখাদ্য (ক) লোহা—গাছপালার অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যকে মাটি থেকে শোষণে সাহায্য করে। (খ) জিঙ্ক বা দস্তা—পাতার সবুজ অংশ গঠনে অণুঘটকের কাজ করে এবং ফসফেট ও পটাশ গ্রহণের সহায়ক হয়। (গ) ম্যাঙ্গানিজ—রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও গাছের শর্করাখাদ্য প্রস্তুতে সহায়ক হয়। (ঘ) কপার বা তামা—গাছের মধ্যে লোহার ব্যবহার ঠিক রাখতে সাহায্য করে। (ঙ) বোরণ—গাছের মধ্যে পটাশ ও চুণের আনুপাতিক হার ঠিক রাখে। নাইট্রোজেন গ্রহণে সাহায্য করে। (চ) মলিবডেনাম—মাটির উপকারি জীবাণু ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রোজেন বন্ধনে সাহায্য করে। গাছের সবুজ অংশ বাড়ায়। (ছ) ক্লোরিন—গাছের পাতা ও ডগার সবুজ অংশ বাড়ায় এবং সতেজ রাখে।

গাছে উদ্ভিদখাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, অভাবজনীত লক্ষণ ও প্রতিকার ঃ

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(ক) **উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য ঃ**

(১) **নাইট্রোজেন (N) ঃ**

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

গাছপালার ডালপালা সবুজ রাখে ও দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য উদ্ভিদ খাদ্যের কার্যকারিতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। মাত্রাধিক প্রয়োগে গাছের রোগপোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফসল দেরীতে পাকে ও গাছ পড়ে যেতে পারে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

গাছপালার কাণ্ড ও শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তলার দিকের পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ে। ফুল ও ফল কম হয়, ফসল আগে পাকে। মোট ফলনও তাতে কমে যায়।

প্রতিকার ঃ

মাটি ও ফসলের প্রয়োজন অনুসারে মাত্রামত নাইট্রোজেন যেমন এ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট, ক্যান এবং ইউরিয়া এর যে কোন একটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রয়োজনে মিশ্র ও যৌগিক সারও প্রয়োগ করা যাবে।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(২) ফসফরাস ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

গাছের বীজ, দানা ও শীষ গঠনে সহায়ক। ডালপালা, কোষ ও নতুন কুঁড়ি গঠনে সাহায্য করে। গাছ সতেজ থাকে ও পাতার সবুজ রঙ বজায় রাখে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায় ও দানাজাতীয় শস্যের গাছে পাশকাঠির সংখ্যা বাড়ায়। সুপুষ্ট, বড় ও সুগঠিত ফল ও দানা গঠনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

ফসল দেরীতে পাকে। গাছ বাড়ে না। গাছে কুঁড়ি ও ফল কম আসে। বীজ ও দানার আকৃতি ও ওজন কমে যায়, ফলন কম হয়। দানা সুপুষ্ট হয় না ও ফলের আকৃতি ও গঠনও ব্যাহত হয়। কাণ্ডে ও পাতায় লাল বা বেগুনে রঙ দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ

সুপার ফসফেট (সিঙ্গল ও ট্রিপল), ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট, বোন মিল, বেসিক স্ল্যাগ, রক ফসফেট ইত্যাদি ফসফেটঘটিত সার মাটি ও ফসলের প্রয়োজনমত প্রয়োগ করা দরকার। এজন্য প্রয়োজনে মিশ্র ও যৌগিক সারও প্রয়োগ করা যায়।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(৩) পটাশিয়াম ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

নাইট্রোজেন ও ফসফেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনে। গাছপালার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও বীজপুষ্ট ও শিকড় গঠনে এবং ফলের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক। পাতায় ও কাণ্ডে ক্লোরোফিলেরও অংশ বাড়ায় এবং শর্করা চলাচলে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

গাছ দুর্বল হয়, পাতা ঝরে পড়ে ও ঝিমিয়ে হেলে পড়ে। গাছ আকৃতিতে ছোট হয়। পাতা ডগা ও শিরার সবুজ অংশ শুকিয়ে ঝলসিয়ে বাদামী রঙের হয়।

প্রতিকার ঃ

পরিমাণমত পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও পটাশিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে কাজ হবে। পটাশমিশ্রিত মিশ্র ও যৌগিক সারও প্রয়োগ করা চলে।

(খ) অপ্রধান খাদ্য ঃ

(১) ক্যালসিয়াম ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

গাছ ক্যালসিয়াম পেলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। উদ্ভিদ কোষ গঠনের সহায়ক হয়। মাটির ব্যাকটেরিয়াল তৎপরতা বাড়িয়ে শিকড় প্রসারে সাহায্য করে। জৈব নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

পাতায় ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। নতুন পাতা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। শিকড় ও ডগার দিকে শুকিয়ে যায়, গাছ খাটো ও মোটা হয়। ফুল ও ফলের কুঁড়ি অসময়ে ঝরে পড়ে এবং কাণ্ড দুর্বল হয়।

প্রতিকার ঃ

মাটি ও ফসলের প্রয়োজন অনুসারে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, জিপসাম, ডলোমাইট, সুপারফসফেট, ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদির যেকোন একটি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাবে।

(২) ম্যাগনেসিয়াম ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

পাতার সবুজ কণিকার একটি ভাল উপাদান। পাতায় তেলতেলে ভাব আনতেও সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

পাতার শিরায় হলুদ ডোরা দাগ পড়ে। অভাব বেশি হলে পাতা ঝরে পড়ে। পাতা কুঁকড়ে উপর দিকে গুটিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ

পরিমাণমত ডলোমাইট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট গাছের ও মাটির প্রয়োজনমত প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) **সালফার (গন্ধক) ঃ**

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

ডাঁটা ও বোঁটা তৈরিতে সাহায্য করে। কাণ্ড সহজে বাড়ে। ফলের আকার সুগঠিত হয় ও খোসা পাতলা হয়।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

নতুন পাতার রঙ হলদে হয়। ফলের আকার বিকৃত, খোসা পুরু ও রসহীন হয়। মূল, কাণ্ড খুব সরু, লম্বা ও শক্ত হয়। ফলের রঙ ফ্যাকাসে হয়।

প্রতিকার ঃ

জিপসাম, এ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফেট ইত্যাদির মাধ্যমে সালফার (গন্ধক) মাটিতে প্রয়োগ করা যায়। মাটির অবস্থা, ফসল, বৃষ্টিপাত, সেচ কতটা কীট-নাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে তার উপর এর মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে।

(গ) **অণুখাদ্য ঃ**

(১) **আয়রণ (লোহা) ঃ**

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

পাতার সবুজ কণিকা তৈরির সহায়ক। গাছের শ্বাসক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও সংবাহক গঠনের কাজে এটি প্রয়োজনীয় উপাদান। গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যকে মাটি থেকে শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

পাতার সবুজ রঙ জ্বলে যায় ও পাতা হলদে বা সাদা রঙ ধারণ করে। কিন্তু শিরা সবুজ থাকে। গাছ বাড়ে না, বীজ ও ফল কম হয়।

প্রতিকার ঃ

ফেরাস সালফেট, সব রকম জমিতে একরে ৩-৪½ কেজি প্রয়োগ করতে হবে মাটিতে। ২৫ গ্যালন জলে ৪০০-৫০০ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(২) জিঙ্ক (দস্তা) ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

উদ্ভিদ হরমোন, নিউক্লিক এ্যাসিড, প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে। এছাড়া ফসফেট, পটাশ গ্রহণের সহায়ক। বীজ গঠনে এবং কোষ ঝিল্লির আংশিক ভেদ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পাতার সবুজ অংশ তৈরিতে অনুঘটকের কাজ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

গাছ বেঁটে হয়ে যায়। গাছের ডগা থেকে নিচের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির পাতা হলদে ও সাদা রঙ ধারণ করতে থাকে। পরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ধান, গম গাছে শীষ বের হতে দেরি হয়। লেবু পাতা ছোট হয় ও ফুল ফল কম হয়। অভাব বেশি হলে নতুন পাতায়ও পাণ্ডু রোগ দেখা দেয়। লেবু পাতায় ক্লোরোসিস রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ

ঘাটতি মেটাতে একর প্রতি ১২-১৫ কেজি জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ২৫/৩০ গ্যালন জলে ৫০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি পরিমাণ জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। মাটি, ফসল ইত্যাদির অবস্থা বুঝে পরিমাণমত জিঙ্ক ক্লোরাইড বা জিঙ্ক অক্সাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৩) ম্যাঙ্গানিজ ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, গাছের শর্করা খাদ্য প্রস্তুতে সহায়ক। পাতায় সবুজ কণিকা তৈরিতে লোহার সঙ্গে কাজ করে। কয়েকটি এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

গাছ নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গাছ বাড়ে না। পাতায় পাণ্ডু রোগ দেখা দেয় ও পাতা জলে যায়, পাতায় ধুসর ফুটকি, গোল দাগ পড়ে। পালং ও ধানে হলদে রোগ দেখা দেয়। গাছ শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার ঃ

সব রকম জমির ঘাটতি মেটাতে একর প্রতি ২১-২৭ কেজি ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ছড়িয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বা গাছ বড় হবার পর বিঘাপ্রতি ১½-২ কেজি হারে ম্যাঙ্গানিজ সালফেট পাতায় স্প্রে করতে হবে। ম্যাঙ্গানাস অক্সাইড ও ব্যবহার করা চলে।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(৪) কপার (তামা) ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

পাতা, কাণ্ড ও ডগা সঠিক ভাবে বাড়ে। পাতায় সবুজ কণিকা তৈরিতে গাছের পুষ্টিতে ও মাটির গুণাগুণ বাড়াতে সাহায্য করে। গাছের মধ্যে লোহার ব্যবহার ঠিক রাখে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

পাতা বিকৃত হয় ও গাছ ও ডালের ডগা শুকিয়ে যায়। ফলের বিশেষ করে লেবুর সঠিক রঙ হয় না ও ফল ফেটে যায়। গাছের গা থেকে বেশি কষ বার হয়। পাতায় পাণ্ডু রোগের আক্রমণ হয় ও কিনারায় দাগ ধরে।

প্রতিকার ঃ

কপার সালফেট বা ব্লু-ভিট্রল (তুঁতে) ৬-১৫ কেজি একরপ্রতি মাটিতে দিতে হবে। ৫০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি তুঁতে ২৫/৩০ গ্যালন জলে গুলে স্প্রে করবেন। এজন্য কপার অক্সাইডও প্রয়োগ করা যাবে পরিমাণমত।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম ঃ

(৫) বোরণ ঃ

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা ঃ

গাছের কাণ্ড, শিকড়, ডালপালা ও কুঁড়ি তৈরিতে সাহায্য করে। গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গাছের কোষ বৃদ্ধির সহায়ক। মাটি থেকে রস নিয়ে পাতায় খাদ্য তৈরির সহায়ক। পটাশ ও ক্যালসিয়ামের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে। নাইট্রোজেন খাদ্য গ্রহণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি :

গাছ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। ফুলকপির কাণ্ড ফাপা, টমেটোর কর্কি করণ, ফুলকপির বাদামী বা ব্রোঞ্জের মত রঙ হয়। বীট, শালগমে বাদামী গর্ত হয়। গাছে ফুল আসে না। গাছের কাণ্ড, ডালপালা, শিকড় ও কুঁড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুলকপির ডাটা পড়ে যায়।

প্রতিকার :

জমি অম্ল ধরণের হলে একরপ্রতি ১·৬ কেজি বোরাক্স (সোহাগা), ক্ষার জমি হলে লাগবে ৯/১০ কেজি। প্রয়োজনে সোহাগা জলে গুলেও স্প্রে করা যায়। ৩০০-৫০০ গ্রাম সোহাগা ২৫ গ্যালন জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম :

(৬) ক্লোরিন :

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা :

পাতা ও ডগা সতেজ রাখতে সাহায্য করে। গাছে জলীয় অংশ ও ক্লোরিনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি :

পাতা, ডাল ইত্যাদি হলদে ও বেগুনে রঙ ধারণ করে শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে। প্রথম দিকে গাছকে নিস্তেজ ও ম্লান দেখায়।

প্রতিকার :

জমিতে এর প্রয়োজন খুবই কম। সুতরাং সাবধানে প্রয়োগ করতে হবে। বেশি প্রয়োগে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। পরিমাণমত পটাশিয়াম ক্লোরাইড, সডিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োগ করা যায়।

উদ্ভিদখাদ্যের নাম :

(৭) মলিবডেনাম :

প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা :

গাছ সতেজ থাকে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি এনজাইমের একটি

অন্যতম উপাদান হওয়ায় গাছের নাইট্রোজেন ব্যবহার ও আবদ্ধ করণে সহায়ক। গাছের সবুজ অংশ বাড়ায় ও মাটির উপকারি জীবাণু ব্যাকটেরিয়াকে নাইট্রোজেন বন্ধনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ ও ক্ষতি ঃ

ফুলকপি ও শুঁটিজাতীয় ফসলের খুবই ক্ষতি হয়। বিশেষকরে ছিপটিজাতীয় রোগের আক্রমণ হয়। পাতার রঙ জ্বলে যায় ও কুঁকড়ে যায়, বিশেষকরে ফুল কপির পাতা শুকিয়ে যায় ও গাছ রোগাক্রান্ত হয়।

প্রতিকার ঃ

সবরকম জমিতেই একরপ্রতি ৬০০-৯০০ গ্রাম সোডিয়াম মলিবডেট বা এ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগ করবেন। ৫০-৭০ গ্রাম ২৫/৪০ গ্যালন জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। সডিয়াম মলিবডেট এ্যানহাইড্রাম, এ্যামোনিয়াম মলিবডেটও প্রয়োজনে পরিমাণমত প্রয়োগ করা যায়।

বিঃ দ্রঃ অণুখাদ্য (সার) প্রয়োগের আগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কৃষি বিভাগের কৃষি বিশেষজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করে মাত্রা, প্রয়োগের সময়, মিশ্রণ ইত্যাদি ঠিক করা উচিত। মাটি পরীক্ষার প্রতিবেদন এজন্য সহায়ক হতে পারে। আন্দাজে অণুখাদ্য প্রয়োগে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অধ্যায় ৭

যৌগিক সার ঃ

যৌগিক সারে এক সঙ্গে ২টি বা তারও বেশি উদ্ভিদখাদ্য থাকে এবং এগুলির মধ্যে ২ টি প্রধান উদ্ভিদখাদ্য থাকে রাসায়নিক উপায়ে মিশ্রিত। সাধারণ সারের চেয়ে এই সারে মোট উদ্ভিদখাদ্য মিলিতভাবে বেশি থাকায় পরিবহণ, প্যাকিং ও সংরক্ষণে কম খরচ পড়ে। যৌগিক সার সাধারণতঃ দানাদার সুতরাং জমিতে সর্বত্র সমান ভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা সহজ। যৌগিক সারে বিভিন্ন গ্রেডের ৩টি প্রধান উদ্ভিদ খাদ্য মিশ্রিত (N P K) সারই এখন পাওয়া যাচ্ছে। মাটির চাহিদা অনুসারে গ্রেড বাছাই করে এই সারের ব্যবহারও বাড়ছে। বর্তমানে আমাদের দেশের কারখানাতে প্রস্তুত যৌগিক সারকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) এ্যামোনিয়াম ফসফেট (২) নাইট্রো ফসফেট (৩) NPK যৌগিক সার।

১। এ্যামোনিয়াম ফসফেট ঃ

বিভিন্ন অনুপাতে এ্যামোনিয়াম ও ফসফেটঘটিত সার। প্রধানত ৩ ধরণের এ্যামোনিয়াম ফসফেট তৈরি হয়।

(ক) এ্যামোনিয়াম ফসফেট সালফেট (APS) ১৬-২০-০, ২০-২০-০
(খ) ইউরিয়া এ্যামোনিয়াম ফসফেট (UAP) ২৮-২৮-০, ২০-২০-০
(গ) ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP)-১৮-৪৬-০

সাধারণতঃ এইসব সারে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়া বা এ্যামাইড রূপে থাকে এবং ফসফেটের অধিকাংশটাই থাকে জলে দ্রবণীয় অবস্থায়। যেসব জমিতে নাইট্রোজেনের তুলনায় ফসফেটের প্রয়োজন বেশি সেখানে এ্যামোনিয়াম ফসফেট খুব কার্যকরি হয়। এ সার চুন ও ক্ষারযুক্ত জমির পক্ষে খুবই উপযোগী।

নাইট্রোফসফেট ঃ

বাজারে এ সার সুফলা ও সুষম নামেই পরিচিত। ট্রম্বে কারখানায় সুফলা ও হলদিয়ায় সুষম দানাসার তৈরি হয়। এই সার ২০ : ২০ : ০ এবং ১৫ : ১৫ : ১৫ অনুপাতে পাওয়া যায়। সুফলা/সুষম (২০ : ২০ : ০) এর রং ধূসর। এতে শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২০ ভাগ ফসফেট থাকে। সুফলা/সুষম (১৫ : ১৫ : ১৫) এর রং গোলাপী। এতে শতকরা ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৫ ভাগ ফসফেট এবং ১৫ ভাগ পটাশ থাকে। এ ছাড়া এতে উদ্ভিদ উপাদান ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার এবং ক্লোরিন থাকে।

শস্য এই সার থেকে এ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট দুভাবেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। এর ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম মাটির অম্লত্ব দূর করে। মাটির অবস্থার উন্নতি করে। এর প্রতিটি দানায় খাদ্য উপাদানগুলি সমান আনুপাতিক হারে থাকে বলে শস্য তা উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতে পারে।

৩। এন-পি-কে (NPK) সার ঃ বিভিন্ন গ্রেডে নানা অনুপাতে এন-পি-কে যৌগিক সার ইদানিং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন যৌগিক সারে শতকরা উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ ২০ নং ছকে দেওয়া হল। এই সার দানাদার, সহজে দ্রবণীয় ও জমিতে সহজে গ্রহণীয়। এই সারও সম্প্রতি চাষীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সুফলা বা নাইট্রোফসফেট সার তৈরি ঃ

বর্তমানে নাইট্রো ফসফেট সার ১৫ : ১৫ : ১৫ এবং ২০ : ২০ : ০ (NPK) প্রধানত এই অনুপাতে বেশি পাওয়া যায়। তবে অন্য অনুপাতেও তৈরি হচ্ছে। রক ফসফেটকে নাইট্রিক এসিড দিয়ে দ্রবীভূত করে এই সার তৈরি করা হয়। নাইট্রো ফসফেট তৈরির প্রধান ৩ টি স্তর হচ্ছে (১) রক ফসফেটকে এসিড দিয়ে দ্রবীভূত করা (২) ফসফেটকে ফসলের গ্রহণযোগ্য রূপে নিয়ে আসা এবং (৩) বাড়তি ক্যালসিয়ামের অপসারণ।

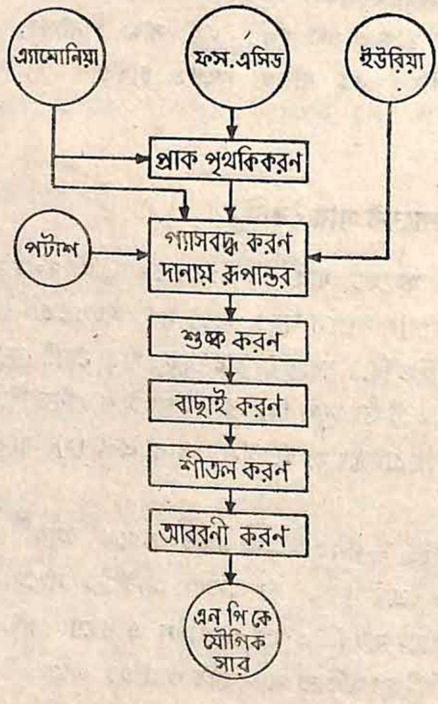
রক ফসফেটকে নাইট্রিক এসিড দিয়ে দ্রবীভূত করলে ফসফরিক এসিডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম নাইট্রেটও তৈরি হয়। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সহজেই বাতাসের বাষ্প অপহরণ করে দলা পাকিয়ে যায়। এ জন্য এ জিনিস এ সারে থাকা উচিত না। এই ক্যালসিয়াম নাইট্রেট বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপসারিত করা হয় এবং এই অপসারণ পদ্ধতি

অনুসারে নাইট্রো ফসফেট (সুফলা ইত্যাদি) সার তৈরির নানা পদ্ধতি আছে। প্রধানত ৩ ভাবে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট অপসারণ করা হয়। (১) ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের এক অংশকে ঠাণ্ডা করে স্ফটিকীকরণের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। অথবা ক্যালসিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অকসাইড এবং এ্যামোনিয়া গ্যাস মিশিয়ে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করা হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে কোন একটি সালফেট লবণ মিশিয়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামকে ক্যালসিয়াম সালফেটরূপে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর ক্যালসিয়াম সালফেটকে পরিশ্রাবণের মাধ্যমে আলাদা করা হয়।

(৩) তৃতীয় পদ্ধতিতে রক ফসফেটকে নাইট্রিক এসিডের সঙ্গে ফসফরিক কিংবা সালফিউরিক এসিড দিয়ে দ্রবীভূত করা হয় যাতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট সৃষ্টি না হতে পারে। নাইট্রোফসফেট সারে থাকে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, মনো এ্যামোনিয়াম ফসফেট

ছক নং (১৯) : **এন. পি. কে যৌগিকসার তৈরির প্রবাহ চিত্র।**



এবং ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট। ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট জলে দ্রবণীয় নয়, মৃদু অম্লত্বে দ্রবণীয়। তাই সুফলাতে মোট ফসফেটের কিছু অংশ অম্লত্বে দ্রবণীয়।

যৌগিকসার ব্যবহারের সুবিধা ঃ

(১) ১ টি উদ্ভিদ খাদ্যযুক্ত ৩টি সার ব্যবহারের চেয়ে ৩টি উদ্ভিদখাদ্য যুক্ত একটি সার ব্যবহারে সুবিধা বেশি। চাষীদের পক্ষে ব্যবহারে ঝামেলা কম।

(২) কোন অবস্থায়ই উদ্ভিদখাদ্যগুলি আলাদা হয়ে যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও কোন অপচয় হয় না।

(৩) এক সঙ্গে তিনটি খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করা সহজ, লাভজনক ও নিরাপদ। পরিবহণে ও গুদামে রাখাও সুবিধা।

(৪) মাটির প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গ্রেডের যৌগিকসার পাওয়া যায়। মিশ্রণে ভুল ত্রুটি হতে পারে না। কারণ যন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট মাপ ও মাত্রায় মিশ্রিত হয়।

(৫) এ সার হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে ছড়ানো সহজ।

(৬) মূলসার হিসাবে প্রধান ৩টি খাদ্য উপাদান বীজ বোনা বা সার প্রয়োগ যন্ত্রের সাহায্যে এক বারেই প্রয়োগ করা সম্ভব।

(৭) এই সারে প্রতিটি দানায় উদ্ভিদখাদ্যের অনুপাত সমান। কাজেই চাষে সুষম সার প্রয়োগ সহজ।

(৮) যৌগিক সারে অন্যান্য উদ্ভিদখাদ্য ও অনুখাদ্যও থাকে বলে মাটিতে ঐ খাদ্য গুলির অভাব পূরণ হয়।

ছক নং (২০) : বিভিন্ন যৌগিকসারে উদ্ভিদখাদ্যের শতকরা পরিমাণ

সারের নাম	মোট নাইট্রোজেন (N)	এ্যামোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন (N)	নাইট্রেট নাইট্রোজেন (N)	এ্যামাইড নাইট্রোজেন (N)	মোট ফসফেট (P_2O_5)	জলে-দ্রবণীয় ফসফেট (P_2O_5)	গ্রহণ-যোগ্য ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ (K_2O)
(১) এ্যামোনিয়াম ফসফেট সালফেট (১৬-২০-০)	১৬·০	১৬·০			২০·০	১৯·৫		
(২) এ্যামোনিয়াম ফসফেট সালফেট (২০-২০-০)	২০·০	১৮·০		২·০		১৭·০	২০·০	
(৩) ইউরিয়া এ্যামোনিয়াম ফসফেট (২৮-২৮-০)	২৮·০	৯·০		১৯·০		২৫·২	২৮·০	
(৪) ডাই এ্যামোনিয়াম ফসফেট (১৮-৪৬-০)	১৮·০	১৮·০			৪৬·০	৪১·০		
(৫) নাইট্রো ফসফেট গ্রেড-১ পটাশসহ (১৮-১৮-৯)	১৮·০	৯·৯	৮·১		১৮·০	৪·৯	১৮·০	৯·০
(৬) নাইট্রো ফসফেট (২০-২০-০)	২০·০	১০·৬	৯·৪		২০·০	৬·৪	২০·০	
(৭) নাইট্রো ফসফেট গ্রেড-২ পটাশসহ (১৫-১৫-১৫)	১৫·০	৮·২৫	৬·৭৫		১৫·০	৪·০	১৫·০	১৫·০

(চ) এন. পি. কে (NPK) যৌগিক সার

(ক) (১০-২৬-২৬)[৩]	১০·০	১০·০		২৬·০	২২·১	২৬·০	২৬·০
(খ) (১২-৩২-১৬)[৩]	১২·০	১২·০		৩২·০	২৭·২	৩২·০	১৬ ০
(গ) (১৪-৩৬-১২)[৩]	১৪·০	১৪·০		৩৬·০	৩০·৬	৩৬·০	১২·০
(ঘ) (১৪-৩৫-১৪)	১৪·০	১৪·০		—	২৯·০	৩৫·০	১৪·০
(ঙ) (১৪-২৮-১৪)	১৪·৮	৮·০	৬·০	২৮·০	২৫·২	২৮·০	১৪·০
(চ) (১৭-১৭-১৭)	১৭·০	৫·০	১২·০	১৭·০	১৫·৩	১৭·০	১৭·০

অধ্যায় ৮

মিশ্রসার ঃ

যে সারে বিভিন্ন গ্রেডে একাধিক উদ্ভিদখাদ্য থাকে তাকে মিশ্র সার বলে। কোন সারে NPK র শতকরা পরিমাণকে গ্রেড বলে। যেমন—৫:১০:১০। বাজারে যে মিশ্রসার পাওয়া যায় তার বস্তার গায়ে ট্রেড নাম, উদ্ভিদখাদ্যের অনুপাত লেখা থাকে।

মিশ্রসার যৌগিক সারের মত দুই বা দুইএর অধিক উদ্ভিদখাদ্য উপাদান মাটিতে সরবরাহ করে। পার্থক্য শুধু প্রস্তুত পদ্ধতিতে। যৌগিকসার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দানা রূপে তৈরি হয়। আর মিশ্রসার হাতে বা যান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন সারের মিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করা হয়। দুই ধরণের সারেই ২ অথবা ২ এর অধিক উদ্ভিদখাদ্য উপাদান থাকে। মিশ্রসার সাধারণতঃ গুঁড়া আকারে তৈরি হয়।

মিশ্রসার তৈরির সঙ্গে নিচের কয়েকটি শব্দ খুবই পরিচিত।

(১) সারের গ্রেড বা পর্যায় (২) সারের অনুপাত (৩) অবস্থা নির্দেশক (৪) পরিপূরক খাদ ইত্যাদি।

১। সারের গ্রেড বা পর্যায় (Fertiliser grade) ঃ

মিশ্রসারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ এর শতকরা কমপক্ষে উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ সুনিশ্চিত কিনা। অর্থাৎ ১২-৬-৬ গ্রেডের ১০০ কেজি মিশ্রসারে কমপক্ষে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ৬ কেজি ফসফেট ও ৬ কেজি পটাশ থাকা দরকার।

২। সারের অনুপাত (Ratio) ঃ

নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের রাসায়নিক সার ২ বা ৩ টি বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে মিশ্রসার তৈরি করা হয়। বিভিন্ন গ্রেডে শস্যের চাহিদা অনুসারে এই অনুপাত রাখা হয়। তার মানে হল ১২-৬-৬ গ্রেড সারের অনুপাত হল ২:১:১।

৩। অবস্থা নির্দেশক (Conditioner) ঃ

মিশ্রসারের প্রকৃতিগত অবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নমানের জৈব পদার্থ, জিপসাম ইত্যাদি মেশানো হয়।

৪। পরিপূরক (Filler) ঃ

কাঙ্খিত বা বাঞ্ছিত মানের মিশ্রসার তৈরি করতে পরিপূরক হিসাবে বালি, মাটি, কয়লা গুঁড়ো, সাজি মাটি ইত্যাদি সারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

মিশ্রসার তৈরি ঃ

আমাদের দেশে গুঁড়ো এবং দানাদার শুষ্ক ঘন মিশ্রসারের ব্যবহার আছে।

১। উপাদান বাছাই ঃ

বিভিন্ন উপাদান যেমন এ্যামোনিয়াম সালফেট, এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, ক্যান, এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদি থেকে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সিঙ্গল ও ট্রিপল সুপার ফসফেট, হাড় গুঁড়ো, রক ফসফেট থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। মিউরেট অথবা সালফেট অব পটাশ থেকে পটাশিয়াম পাওয়া যায়। মিশ্রসারের উপাদান হিসাবে বিশেষকরে নাইট্রোজেন ও ফসফেটের যোগানের জন্য এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং নাইট্রো ফসফেট জাতীয় যৌগিক সার ব্যবহার করা যায়।

২। চাষে উপযোগিতা ঃ

এই সব উপাদান (সার) জমি ও ফসলের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। যেমন— পটাশিয়াম ক্লোরাইড তামাক, কিছু সবজি ও ফল চাষের উপযোগী নয়। কিছু লোহা মিশ্রিত অম্ল মাটিতে সব সার ব্যবহার করা যায় না।

৩। সারের কাঙ্খিত মান ঃ

গতানুগতিক নিচু মানের সার-উপাদান নিয়ে উঁচু মানের মিশ্রসার তৈরি করা সম্ভব না। ১৫-১৫-১৫ মানের মিশ্রসার তৈরি করতে উঁচু মানের ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট, এ্যামোনিয়াম ফসফেট ইত্যাদি ব্যবহার করা দরকার।

৪। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ঃ

ভৌত ও রাসায়নিক পার্থক্যের জন্য বেশ কিছু সারের সঙ্গে কিছু সারের মিশ্রণ সম্ভব

না। মিশ্রণের ফলে কোনটি গলে যাবে, কোনটি দলা পাকিয়ে যাবে, আবার কোনটি রাসায়নিক মিলনে উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে, যা উদ্ভিদখাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে দাঁড়াবে। যেমন বেসিক স্ল্যাগের সঙ্গে সালফেট অব এ্যামোনিয়া বা ক্যান এর মিশ্রণ সম্ভব না। ছক নং—২২ দেখুন।

৫। **প্রস্তুত প্রণালী ঃ**

মিশ্রসার তৈরি করতে নিচের সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন একক সারের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

$$\text{মিশ্রসার} = \frac{\text{মিশ্রসারে শতকরা উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ} \times \text{মোট মিশ্রসারের পরিমাণ}}{\text{একক সারে উদ্ভিদখাদ্যের শতকরা পরিমাণ}}$$

১০০ কেজি ৮:৮:৮ গ্রেডের মিশ্রসার তৈরির জন্য বিভিন্ন সারের পরিমাণ নিচে বের করে দেখান হল।

৬ শতাংশ নাইট্রোজেন,	এ্যামোনিয়াম সালফেট আকারে	$\frac{৬ \times ১০০}{২০} = ৩০$ কেজি
২ ”	ইউরিয়া আকারে	$\frac{২ \times ১০০}{.৪৫} = ৪.৫$ কেজি
৮ ”	ফসফেট, সুপার ফসফেট আকারে	$\frac{৮ \times ১০০}{১৬} = ৫০$ কেজি
৮ ”	পটাশ, মিউরেট অব পটাশ আকারে	$\frac{৮ \times ১০০}{৫০} = ১৬$ কেজি
	মোট ঃ	৯৭.৮ কেজি
	পরিপূরক	২.২ কেজি

মিশ্রসার জমিতে প্রয়োগ ঃ

সাধারণ সারের মতই মিশ্রসার জমিতে প্রয়োগ করা যায়। অপচয় রোধে মাটি পরীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে এই সার প্রয়োগ করা দরকার। এই সার প্রয়োগের সুবিধাগুলি দেওয়া হল।

সুবিধা ঃ

১। চাষী একটি প্যাকেটেই মিশ্রিত অবস্থায় সবরকম উদ্ভিদ-খাদ্য-গুণসম্বলিত সার পায় বলে পরিশ্রম ও খরচ কমে।

২। সার নির্বাচনে ও পরিমাণ ঠিক করতে কম ভুল হয়।

৩। অন্যান্য সারের তুলনায় সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।

৪। প্রয়োজনে অল্প পরিমাণে অনুখাদ্যও এর সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

৫। এভাবে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ সম্ভব বলে ফলন ও লাভ দুইই বেশি হয়।

৬। মিশ্রসার চাষী নিজেই তৈরি করে নিতে পারে।

অসুবিধা ঃ

১। মিশ্রসারের মাধ্যমে সব উদ্ভিদখাদ্য প্রয়োগের ফলে কোন বিশেষ ফসলের প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট উদ্ভিদখাদ্যটির সময়মত সমন্বয় ঘটানো যায় না।

২। ভিন্নভাবে প্রতিটি উদ্ভিদখাদ্যের দামের তুলনায় প্রতি কেজি মিশ্রসারে উদ্ভিদখাদ্যের দাম বেশি পড়ে।

ছক নং (২১) ঃ **পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রেডের মিশ্রসার**

নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ	সুপারিশকৃত শস্য
৮	৮	৮	রাজ্যের বিভিন্ন অংশের
১২	১২	১২	মাটি ও শস্যের অবস্থা
১৫	১৫	১৫	বিশেষে প্রায় সব শস্যেই
২০	২০	০	প্রয়োগযোগ্য
১২	১২	০	
১০	৫	১০	চা

যেসব সারের মিশ্রণ ঘটান উচিত না ঃ

কিছু সার আছে যাদের একের সঙ্গে অন্যটির মিশ্রণ ঘটালে সারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। মিশ্রসারের কয়েকটি নিজস্ব গুণ থাকা দরকার। দেখতে হবে মিশ্রণের পর যেন খাদ্য উপাদানের মান কমে না যায়। আর্দ্র বায়ুর প্রভাবে মিশ্রসার জমাট না বাঁধে। মিশ্রিত সার যেন সহজে চলাচল করতে পারে।

যেমন গোবর, পাতাসার এবং এ্যামোনিয়াঘটিত কোন সারের সঙ্গে চুন একবারে মিশ খাবে না। পটাশ ও ইউরিয়ার সঙ্গে চুন মেশান চলবে তবে অন্যকোন সারের সঙ্গে না। হাড়গুঁড়ো যে কোন সারের সঙ্গে মেশান চলে। রক ফসফেটের সঙ্গে সালফেট অব এ্যামোনিয়া ও খইলের মিশ্রণ উচিত না। এ্যামোনিয়া সালফেটের সঙ্গে আবর্জনা পচা সার মিশ খাবে না। চুনের সঙ্গে সুপার ফসফেটের বিরোধ থাকায় এদুটির মিশ্রণ ঘটান

উচিত না। পতিত জমিতে বা চাষের অন্ততঃ ৫০/৬০ দিন আগে চুন প্রয়োগ করলে মাটিতে মিশে গিয়ে এর তেজ কমে যায়। তখন জমিতে অন্য সার প্রয়োগে বাধা থাকবে না।

সারের মিশ্রণযোগ্যতা বিষয়ে নির্দেশক ঃ

রাসায়নিক কারণেই সব সার সব সারের সঙ্গে মেশানো যায় না। আবার কিছু সার আছে যা অনায়াসেই অন্য সারের সঙ্গে মেশানো যাবে। কিছু সার আছে যা দীর্ঘকাল মিশিয়ে রাখলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

তাহলে কোন সার অন্য সারের সঙ্গে মেশান যায় কিনা কি করে বুঝবেন? প্রথমে প্রয়োজনীয় সারটি সোজাসুজি লাইনে দেখে নিন এবং যে সারটি এর সঙ্গে মেশাতে চান তা আড়াআড়ি লাইনে দেখুন। যেখানে এই দুটি লাইন মিলেছে সেখানের চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে ঐ সব সারের মিশ্রণ সম্ভব কিনা। নিচের নির্দেশক নিশানা দেখে ছকে এটা বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

ছক নং (২২) ঃ **মিশ্রসারে বিভিন্ন সারের মিশ্রণযোগ্যতা।**

	অ্যামোনিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	ইউরিয়া	বেসিক স্ল্যাগ	ক্যালসিয়াম কারবোনেট	বোন মিল বা হাড় গুঁড়ো	সুপার ফসফেট	মিউরেট অব পটাশ	সালফেট অব পটাশ	গোবর কম্পোস্ট এবং অন্য পচাই সার	কারখানার ছাই
অ্যামোনিয়াম সালফেট	—	○		○	⊠	⊠					⊠	⊠
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	○	—	⊠	○	⊠	⊠		○	○	○	⊠	⊠
ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট		⊠	—	○	⊠			○	○	○	⊠	⊠
ইউরিয়া	○	○	○	—	○	○		○	○	○	○	○
বেসিক স্ল্যাগ	⊠	⊠	⊠	○	—			⊠			⊠	
ক্যালসিয়াম কারবোনেট	⊠	⊠		○		—		⊠			⊠	
বোন মিল বা হাড় গুঁড়ো							—					
সুপার ফসফেট		○	○	○	⊠	⊠		—				⊠
মিউরেট অব পটাশ		○	○	○					—			○
সালফেট অব পটাশ		○	○	○						—		○
গোবর কম্পোস্ট এবং অন্য পচাই সার	⊠	⊠	⊠	○	⊠	⊠					—	⊠
কারখানার ছাই	⊠	⊠	⊠	○				⊠	○	○	⊠	—

নিশানা

□ মেশানো যাবে

○ ব্যবহারের ঠিক আগে মেশানো যাবে

⊠ মেশানো যাবে না। তবে সারকে শুকনো রাখার জন্য হাড় গুঁড়ো প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

অধ্যায় ৯

মাটির গঠন ঃ

মাটির প্রকৃতি ও সার নির্বাচন ঃ

জমির ক্ষারত্ব এবং অম্লত্ব পি, এইচ (P. H) এর মান থেকে বোঝা যায়। পি, এইচ এর ডিগ্রি দিয়ে জমির ক্ষারত্ব ও অম্লত্ব বোঝান হয়।

পি, এইচ স্কেলে ৭ নিরপেক্ষ জমিকে বোঝায়। ৭ এর নিচের সংখ্যাগুলি অম্লাত্মক এবং ৭ এর উপরের সংখ্যাগুলি জমির ক্ষারত্ব বোঝায়। জমির ক্ষারত্ব ও অম্লত্ব একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম করলে গাছপালা শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অবশ্য কিছু কিছু গাছ বেশি অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি পছন্দ করে। তবে সাধারণ গাছের পক্ষে পি-এইচ মাত্রা ৭.৫ পর্যন্ত হওয়া উচিত। ভাল ফসল পেতে জমিতে প্রয়োজনের বেশি বা কম পি. এইচ থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া দরকার। সাধারণতঃ মাটির পি. এইচ ৪ থেকে ৯ এর মধ্যে হয়। মাটি পরীক্ষা করে এতে সঠিক কত পি-এইচ-আছে তা জানতে পারবেন।

ছক নং (২৩) ঃ **বিভিন্ন পি. এইচ অবস্থায় শস্যের ফলন।**

মাটির পি. এইচ	৪.৭	৫.০	৫.৭	৬.৮	৭.৫
ভুট্টা	৩৪	৭৩	৮৩	১০০	৮৫
গম	৬৮	৭৬	৮৬	১০০	৯৯
যব	৭৭	৯৩	৯৯	৯৯	১০০
বার্লি	০	২৩	৮০	৯৫	১০০
সয়াবিন	৬৫	৭৯	৮০	১০০	৯৩

বিঃ দ্রঃ উপরের ছকে সবচেয়ে ভাল ফলনকে ১০০ ধরে বাকিদের শতকরা হিসাবে দেখান হয়েছে।

বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি থেকে সহজে দ্রবণীয় চুনজাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি জলের সঙ্গে চুইয়ে জমি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় জমি অম্লভাবাপন্ন হয়। এতে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পায়।

অম্ল ও ক্ষার জমি ও গাছের বাড় ঃ

বেশি অম্ল জমিতে মাটির অন্য উপাদান এ্যালুমিনিয়াম গাছের উপর বিষের ন্যায় কাজ করে। জমির ক্যালসিয়াম কমে যায়, ফলে গাছ বাড়তে পারে না। এ জন্য মাটির অম্লত্ব শোধন করে সার প্রয়োগ করা উচিত। ক্ষার জমির গাছের 'টিস্যু গুলি' আক্রান্ত হয় এবং গাছ প্রয়োজনমত জল গ্রহণ করতে না পারায় গোড়ায় পচন ধরে। প্রয়োজনীয় মাত্রার পি-এইচ গাছকে জমির অন্যান্য উপাদান গুলি গ্রহণ করতে সাহায্য করে। বেশি বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি থেকে সহজে দ্রবণীয় চুণজাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি জলের সঙ্গে চুইয়ে নষ্ট হয়।

পি-এইচ ও সার ঃ

মাটির পি, এইচ ঠিকমত না থাকলে যথেষ্ট সার দিলেও গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। মাটিতে ৬ থেকে ৬.৯ পি, এইচ থাকলে মাটির জৈব উপাদানগুলি শীঘ্র মিশে যায় ও গাছপালার গ্রহণযোগ্য হয়। জমিতে বেশি অম্ল বা ক্ষার থাকলে জমির নিজস্ব নাইট্রোজেন গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না। মাটিতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় পি-এইচ থাকলে গাছকে জমির অন্যান্য উপাদানগুলি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

বেশি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি দ্রবণীয় চুনজাতীয় পদার্থ সহজেই জলের সঙ্গে চুইয়ে জমি থেকে বেরিয়ে যাবার ফলে জমি অম্লভাবাপন্ন হয়। এতে মাটির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে জমির অম্লত্ব এবং চুন প্রয়োগের পরিমাণ জানা যাবে। অম্লত্ব শোধন করতে চুনজাতীয় পদার্থ হিসাবে ডলোমাইট, পোড়া চুন ঘুটিং চুর্ণ, বেসিক স্ল্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

ফসফরাস ও পি-এইচ ঃ

মাটির ফসফরাস গাছ কতটা পেতে পারে তা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে মাটির পি-এইচ এর উপর। এই পি-এইচ মাত্রা ৭.৩ এর বেশি হলে মাটির ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিশে ক্যালসিয়াম ফসফেট নামক যৌগিক পদার্থে পরিণত হলে গাছ তা গ্রহণ

করতে পারে না। মাটির পি-এইচ এর মাত্রা স্বাভাবিক হলে (৬-৭'৫) ফসফরাস অধিক পরিমাণে সহজলভ্য হয়। জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পি-এইচ থাকলে যে কোন গাছ সুস্থ এবং সবল থাকে। অম্ল ও ক্ষার মাটিতে ফসফরাসের অধিকাংশই অদ্রবণীয় রূপে আবদ্ধ থাকে। লাল কাঁকুড়ে অম্ল মাটিতে ফসফরাসের অভাব থাকে। অম্ল মাটিতে লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, কপার অধিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। ক্ষার মাটিতে এসব উপাদানের অভাব ঘটে।

ছক নং (২৪) : **সাধারণ সারে অম্লত্বের পরিমাণ**

সারের নাম	নাইট্রেট এর পরিমাণ	অম্লত্ব	মন্তব্য
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	২৪'০	১২৮	১০০ ভাগ সার ব্যবহারে মাটি যে পরিমাণ অম্লাত্বক হয় তাকে স্বাভাবিক করতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) এর সম পরিমাণ অম্লের প্রয়োজন। যেমন এ্যামোনিয়াম সালফেটএ ১১০ পরিমাণ অম্লকে স্বাভাবিক করতে ১০০ কেজি ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সম পরিমাণ অম্লের প্রয়োজন।
এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	৩৩'৫	৬০	
এ্যামোনিয়াম সালফেট	২০'৫	১১০	
এ্যাঃসালফেট নাইট্রেট	২৬'০	৯৩	
ইউরিয়া	৪'৫০	৮০	

১. ক্ষার মাটিকে চাষের উপযোগী করতে জমিতে সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২. শীঘ্র চাষযোগ্য করতে জৈব সার, কম্পোষ্ট বা পচাইসার ও আবর্জনা সার প্রয়োগ করা দরকার ঐ মাটিতে।

৩. জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) ও গন্ধক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জিপসাম প্রয়োগ :

জমি গভীর করে চষে জিপসাম খুব গুঁড়ো করে মাটিতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে মাটির উপরের ৩/৪ ইঞ্চি স্তর পর্যন্ত

প্রথমে সংশোধিত হয়। পরে গাছ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জিপসাম জলের সঙ্গে চুইয়ে মাটির ভিতরে পৌঁছাবে ও আস্তে আস্তে মাটির উন্নতি ঘটাবে।

গন্ধক প্রয়োগ :

ক্ষার মাটিকে সংশোধন করতে গন্ধক প্রয়োগ করা যায়। এঁটেল মাটিতে গন্ধক প্রয়োগে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বেলে মাটিতে গন্ধকের মাত্রা বেশি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষার জমি চাষযোগ্য করতে মাটি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। মাটির পি-এইচ মাত্রা জেনে কৃষি বিশেষজ্ঞ কারোর পরামর্শ অনুসারে এটা করাই ভাল।

অধ্যায় ১০

জমির মাটি পরীক্ষা ঃ

কোন জমিতে কতটা উদ্ভিদখাদ্য উপাদান আছে তা জমির চেহারা দেখে বলা যায় না। জমির মাটির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে জমিতে কোন খাদ্য উপাদানের ঘাটতি কতটা আছে। ধরাযাক জমির প্রয়োজন না জেনে আপনি ৫-১০-৫ পরিমাণ সার দিলেন। কিন্তু দেখা গেল ঐ জমিতে প্রকৃত ঘাটতি ১০ ভাগ নাইট্রোজেন, ২ ভাগ ফসফরাস এবং ১০ ভাগ পটাশ। তাহলে জমিতে ঘাটতি রয়ে গেল ৫ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৫ ভাগ পটাশের এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৮ ভাগ (শতকরা) ফসফরাস জমিতে অপচয় হল। অর্থাৎ আন্দাজে সার দিলে অর্থের ক্ষতি, সারের অপচয়, পরিশ্রম নষ্ট ও ফসল উৎপাদন কম হবে।

অনেকসময় চাষীরা আন্দাজে জমিতে একনাগাড়ে বহুবছর ধরে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে জমির ও ফসলের ক্ষতি করে থাকে। মাটি ও ফসলের উপযোগী সঠিক মাত্রায়, সঠিক ভাবে, ঠিক সময়ে সুষম সার দেওয়া দরকার। এজন্য মাটি পরীক্ষা খুব জরুরী ব্যাপার।

মাটি পরীক্ষার প্রয়োজন কেন ? ঃ

গাছের বাড় ও পুষ্টির জন্য মোট ১৭ টি খাদ্য উপাদান সে মাটি থেকে গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ এর মধ্যে গাছের পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। গাছের কোন খাদ্য উপাদানটি কখন কি ভাবে প্রয়োজন তা সঠিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় না থাকলে গাছ তা নিতে পারে না। ফলে গাছের বা ফসলের পুষ্টি হয় না। নানা রোগ পোকায় ধরে। ফলন কম হয়। গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন খাদ্য কতটা দরকার, তা সেই জমিতে কতটা আছে তা চাষের আগেই মাটি পরীক্ষা করে জানা যায়। মাটি পরীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতেই সুষম সার প্রয়োগ করলে সারের অপচয় কম হয়, খরচ কমে ও ফসল ভাল হয়।

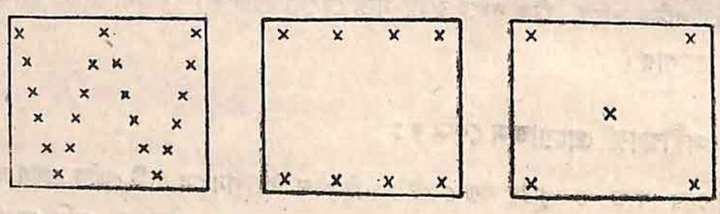
মাটি পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা আপনি নিজেই মাটি পরীক্ষাগারে পাঠাতে পারেন। অথবা ব্লক অফিস, সার বিক্রেতা বা ফার্টিলাইজার অফিসের কর্মী বা তাঁদের অফিস মারফতও পাঠাতে পারেন। এছাড়া ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষার গাড়ি আপনার এলাকায় এলে তখন বিনা ব্যয়ে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। এই মাটি পরীক্ষা করাতে কোন খরচ নেই।

নমুনামাটি সংগ্রহ ঃ

সংগৃহীত নমুনা মাটির সঠিক প্রকৃতি, অবস্থান, ফসল, সার প্রয়োগ ও ফলনের তারতম্য অনুসারে জমিকে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে আলাদা নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি নমুনার জন্য একরপ্রতি ১০/১৫টি জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করে একসঙ্গে মেশাতে হবে। সাধারণতঃ ৬ ইঞ্চি গভীর থেকে নমুনা মাটি নেওয়া উচিত। কিন্তু একটু বড় গাছের জন্য আরো গভীর থেকে মাটির নমুনা নেওয়া দরকার।

পুরানো জলাজমি, গাছের আওতা, সারের গর্ত, সার দেওয়া জমি, পুরানো ঢিবি, জলা নিচু জমি, ভেজা মাটি থেকে নমুনা নেওয়া উচিত না। ২৫ নং ছকে নমুনা মাটি সংগ্রহের সঠিক ও ভুল দুটি পদ্ধতিই দেখানো হয়েছে।

ছক নং (২৫) ঃ **পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা সংগ্রহ**



১নং চিত্র। সঠিক পদ্ধতি ২নং চিত্র। ভুল পদ্ধতি ৩নং চিত্র। ভুল পদ্ধতি

১নং চিত্রে সমস্ত জমির মধ্যে একটি ইংরেজী 'W' অক্ষরের মত করে সব জায়গা থেকেই মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এটিই সঠিক পদ্ধতি। জমির এদিক ওদিক থেকে এলোমেলো ভাবে মাটি সংগ্রহ (২নং ও ৩নং চিত্র) করা ঠিক না। এদুটি ভুল পদ্ধতি।

ছক (২৬) **পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মাটির উর্বরতার মান ঃ**

জেলা	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
(১) ২৪ পরগণা	নিম্ন	মধ্যম	মধ্যম
(২) হাওড়া	মধ্যম	ঐ	ঐ
(৩) হুগলী	ঐ	ঐ	উচ্চ
(৪) মুর্শিদাবাদ	ঐ	ঐ	ঐ
(৫) নদীয়া	নিম্ন	ঐ	মধ্যম
(৬) বর্ধমান	ঐ	ঐ	ঐ
(৭) বাঁকুড়া	ঐ	ঐ	ঐ
(৮) বীরভূম	ঐ	নিম্ন	ঐ
(৯) পুরুলিয়া	ঐ	ঐ	ঐ
(১০) মেদিনীপুর	ঐ	মাধ্যম	ঐ
(১১) দার্জিলিং	উচ্চ	ঐ	উচ্চ
(১২) জলপাইগুড়ি	ঐ	ঐ	মধ্যম
(১৩) কুচবিহার	নিম্ন	ঐ	ঐ
(১৪) পশ্চিম দিনাজপুর	ঐ	ঐ	ঐ
(১৫) মালদা	ঐ	ঐ	ঐ

মাটি কিভাবে সংগ্রহ করবেন ও পাঠাবেন?

মাটির উপরের আগাছা সরিয়ে পরিষ্কার কোদাল বা খুরপি দিয়ে একটি মাটির চাপ তুলে নিয়ে বালতিতে রাখুন। প্রয়োজনে জমির বিভিন্ন জায়গা থেকে একইভাবে মাটি সংগ্রহ করুন। (২৫ নং ছক দেখুন।)

ভেজা মাটি শুকিয়ে গুঁড়ো করে কাগজে রেখে ভালো করে মিশিয়ে ৪ ভাগে ভাগ করে বিপরীত দিকের ২ ভাগ ফেলে দিন। বাকিটা মিশিয়ে মিশিয়ে আবার ঐ ভাবে ফেলে দিন। এই ভাবে শেষ পর্যন্ত আধ কেজি মত মাটি নমুনার জন্য রাখুন। পলিথিন বা কাপড়ের ব্যাগে নমুনা মাটি রেখে ভিতরে ও বাইরে একটি করে কাগজে পরিচিতি ট্যাগ দিয়ে ব্যাগ বেঁধে দিন।

পরিচিতি ট্যাগে আপনার নাম ঠিকানা, তারিখ, জমির অবস্থান, কতটা গভীরে

মাটি, মাটির প্রকার (এঁটেল, দোয়াঁশ, বেলে), সেচের স্থবিধা আছে কিনা এবং কি ফসলের চাষ করবেন ইত্যাদি পরিষ্কার করে লিখবেন।

পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের ঠিকানা ঃ

(১) মৃত্তিকা রসায়নবিদ, মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, ২৩০ এ, নেতাজী স্থভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০।

(২) মৃত্তিকা রসায়নবিদ, মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পোঃ জেলাঃ বর্ধমান।

(৩) মৃত্তিকা রসায়নবিদ, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ, মুচিপাড়া, পোঃ দুর্গাপুর, বর্ধমান।

(৪) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষিবিভাগ, পোঃ কালিম্পং, জেলাঃ দার্জিলিং।

(৫) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষি বিভাগ, পোঃ ও জেলাঃ মেদিনীপুর।

(৬) মুখ্য মৃত্তিকা রসায়নবিদ, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ, বিধান রোড, শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিং।

(৭) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, কৃষি বিভাগ, পোঃ জেঃ মালদা।

(৮) মৃত্তিকা পরীক্ষাগার, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, কল্যাণী ভিলা, নিবেদিতা রোড, পোঃ প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং।

(৯) ফসফেট কোং লিঃ, পোঃ রিষড়া, জেঃ হুগলী।

এছাড়া দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি, মেদিনীপুরে আছে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ ও ভারত-ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষাগার।

প্রধান দফতরের ঠিকানা ঃ

(১) কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা-৭০০০০১

(২) হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০০১

(৩) ভারত-ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ১২ বি, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১

অধ্যায় ১১

জৈব সার

যা জীবন থেকে আসে তাই জৈব। মানুষ, পশুপাখির মলমূত্র, রক্ত, হাড়, গাছের ডালপালা, শিকড় যা মাটির উর্বরতা রক্ষায় ও বেশি ফলনের জন্য জমিতে প্রয়োগ করা হয় সবই জৈব সার।

জৈব সার মাটির উর্বরতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা করে। ভূমিক্ষয় রোধ করে, জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মাটিতে বায়ু চলাচলে সাহায্য করে।

মাটিতে জৈব সার বিশেষ করে গোবর সার দিলে ফসল ভাল হয়। একথা ষোড়শ শতকের একজন ফরাসী কুম্ভকার বার্নাড পেলিসি প্রথম বলে ছিলেন। যদিও আজকাল এলোমেলো ভাবে রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন এক নাগাড়ে ১৬০ বছরের বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে বায়ুমণ্ডল দূষিত হতে পারে। ভারতের মাটিতে কৃত্রিম নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগে অপচয় বেশি হয়। এ জন্য জৈব সারের গুরুত্বও বাড়ছে। কৃষিতে খরচ কমাতে দেশের প্রাকৃতিক জৈব উৎসকে উন্নত প্রথায় নাইট্রোজেনঘটিত সার তৈরির কাজে লাগাতে হবে। নিচে কয়েক প্রকার জৈব সারের পরিচয় দেওয়া হল।

(১) আবর্জনা সার ঃ

আবর্জনা থেকে উঁচু মানের জৈব সার পেতে গরু, মোষের খামার বা খাটালের পরিত্যক্ত অংশ থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরি করা হয়। পশু ও পাখির মলমূত্র, ঘাস, খড়, পাতা, ফসলের ডাঁটা, ছোবড়া ইত্যাদি মিশিয়ে, পচিয়ে ভাল সার পাওয়া যায়। এই সারে গড়ে শতকরা ০·৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। দেখা গেছে ২৫ টন আবর্জনা সার প্রতি হেক্টরে ১১৩ কেজির মতো নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে।

ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ। এদের মলমূত্র থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও এর অধিকাংশই নানাভাবে নষ্ট হয়। তবে যেসব খামারে পশুপালনের ব্যবস্থা নেই, সেখানে খড়, ভূট্টার ডাঁটা, আখের ছোবড়া, কলা-

গাছের কাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে যৌগ নাইট্রোজেন দ্রবণের বিক্রিয়ায় খামার সারের সমান জৈব সার তৈরি হয়। ১ টন আবর্জনা পচা সারে মোটামুটি ৭০০ গ্রাম বোরন, ৩৩০০ গ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ২৫০০ গ্রাম তামা, ১৫৭০ গ্রাম দস্তা এবং ২০ গ্রাম মলিবডেনাম থাকে।

শহর কম্পোষ্ট ঃ

শহরের পরিত্যক্ত অংশ যেমন পৌরসভার আবর্জনা, বিষ্ঠা, নর্দমার ময়লা, কলকারখানার আবর্জনা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি কম্পোষ্ট সারে গড়ে শতকরা ১·৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। মানুষের মলমূত্র থেকে তৈরি জৈবসারে বেশি নাইট্রোজেন থাকে। কলকাতার পাশে ধাপায় এই ধরণের মলমূত্র সারেই ভাল ফুলকপি ও অন্যান্য শাক সবজি চাষ হয়। এইসব আবর্জনা ও মলমূত্রকে সারে পরিণত করার জন্য কলকাতার পুব পাশে বানতলা ও কাদাপাড়ায় বড় বড় কারখানাও তৈরি হয়েছে। এই সারে টনপ্রতি ৫/৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৭/৮ কেজি ফসফেট এবং ৬/৭ কেজি পটাশ আছে বলে দাবি করা হয়।

গোবরগ্যাস প্ল্যাণ্টের সার ঃ

ইদানীং গ্রামের দিকে গোবরগ্যাস বা বায়োগ্যাস প্ল্যাণ্ট বাড়ছে। এইসব প্ল্যাণ্ট থেকে পাওয়া জৈবসারে সাধারণতঃ শতকরা ২·০ থেকে ২·৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেনের শতকরা ১০-১৫ ভাগ এ্যামোনিয়ারূপে থাকে। গলা বা ভেজা অবস্থায় এই সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতি করতে পারে। এজন্য ছায়ায় শুকিয়ে প্রয়োগ করাই ভাল। এতে নাইট্রোজেনের গড় পরিমাণ শতকরা ১·৮ ভাগ হবে।

ছক—(২৭) **কলকাতা শহরের আবর্জনার গঠন (শতকরা হিসাবে)** (১)

নাড়িভুঁড়ি	১৬·০৫	চামড়া	০·৮৬
পাতা	১৩·০৫	হাড়	০·৪২
ঘাস ও খড়	৬·৩১	পোড়া কয়লা	৮·০৮
ডাবের খোসা	৪·৯৬	পোড়া মাটি	৬·৬৫
ছেঁড়া কাপড়	৩·৯০	নুড়ি ইত্যাদি	১·৮৩
ছেঁড়া কাগজ	৩·১৮	লোহা ও অন্যান্য ধাতু	০·৬৬
মাটি ও ছাই	৩৩·৫৮	গ্লাস	০·৩৮

(২) **রাসায়নিক গঠন ঃ**

নাইট্রোজেন	০·৫৫	জৈব বস্তু	৩৫·২৪
ফসফেট	০·৫৮	কার্বন	১৯·৫৮
		জলীয় অংশ	৪১·১২
পটাশ	০·৪১	কার্বন ঃ নাইট্রোজেন	৩৬ ঃ ১

কম্পোষ্ট সার লাভজনক কেন ?

(১) সার প্রয়োগে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে এবং মাটির গঠন ও ভৌত প্রকৃতির উন্নতি হয়।

(২) গাছের খাদ্যউপাদানগুলি ফসল সহজে গ্রহণ করে এবং নাইট্রোজেন ও পটাশ সহজে গ্রহণযোগ্য হয়।

(৩) এই সার প্রয়োগে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও মাটির মধ্যের বায়ু চলাচল ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে বেশি ফসল উৎপাদনে সহায়ক হয়।

(৪) মাটির মধ্যের জীবাণুগুলিকে এই সার প্রয়োগে সক্রিয় ও সতেজ হতে সাহায্য করে এবং মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

(৫) কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করলে ঐ জমিতে অল্প পরিমাণ রাসায়নিক সার দিলেই চলে। আর এ সার যে কোন জমিতে ব্যবহার করা চলে।

সাধারণ কম্পোষ্ট সার তৈরি ঃ

বর্ষাকালে শহরতলী ও গ্রামে-গঞ্জে ঝোপ-জঙ্গল ও কচুরিপানার খুব বৃদ্ধি হয়। গাছের পাতা, কচি ডালপালা, ক্ষেত নিড়ানো আগাছা, আখের ছোবড়া ও ছড়ানো পাতা, খড়কুটো, তরকারি খোসা, খামারের জঞ্জাল, কচুরিপানা, গরুর জাবনার কুটোকাটা, গোবর ও গো-চোনা ইত্যাদি পচিয়ে এই সার তৈরি করতে হয়। একটু উঁচু জায়গায় ৬ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া ও ২ হাত গভীর গর্ত করে তাতে এইসব আবর্জনা ফেলে পচতে দিতে হবে। এ গর্তটির দেয়াল পাকা হলে ভাল হয়। ২ মাস পরপর গর্তের সার কোদাল দিয়ে উল্টেপাল্টে করে দিতে হয়। মাস ৪ বাদে এ সার জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

অল্প দিনে কম্পোষ্ট :

চাষের সময় এসে গেছে অথচ হাতের কাছে কম্পোষ্ট বা পচাই সার নেই, তখন অগত্যা সাধারণ গোবর সার বা কম্পোষ্টের সঙ্গে টনপ্রতি ২০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট মিশিয়ে ২/৩ সপ্তাহ ছায়ায় ঢেকে রেখে ভাল কম্পোষ্ট সার তৈরি করা যায়।

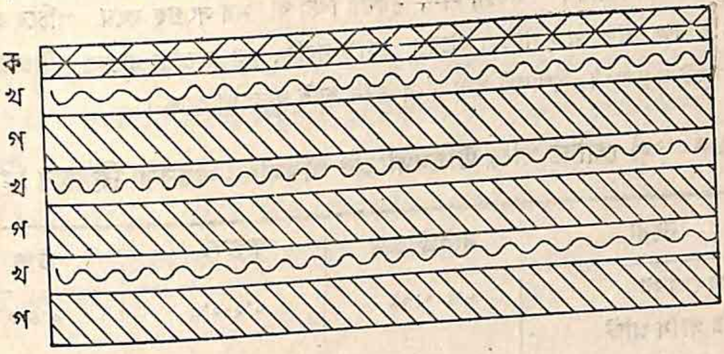
কম্পোষ্ট তৈরির আধুনিক পদ্ধতি :

উঁচু ডাঙা জায়গায় ৬ হাত লম্বা, ৩ হাত চওড়া ও ২ হাত গভীর পাকা গর্ত করে তাতে সব রকম আবর্জনা জড়ো করে গর্তের তলায় ১ ফুট স্তর করে বিছিয়ে দিন। এর উপর ১ ইঞ্চির মত স্তর করে গোবর গোলা জল ছিটিয়ে দিন। প্রথম স্তরের মত আবার ১ ফুট আবর্জনার স্তর এর উপরে বিছিয়ে ১ ইঞ্চি গোবর জল ছড়িয়ে দিন। এইভাবে আবর্জনা ও গোবরের স্তর সাজিয়ে যখন গর্তের উপর ২/৩ হাত উঁচু হবে তখন এর চার-পাশে ও উপরে এঁটেল কাদামাটি দিয়ে ভাল করে লিপে দিন। জল-বৃষ্টি যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য হোগলা, পলিথিন বা বাঁশের খলফা দিয়ে ছাউনি দিলে ভাল হয়। পরিবার পিছু ২টি গর্ত রাখলে একটির সার প্রয়োগ করতে করতে অন্যটি ভরবে।

প্রতি স্তরে ২ কেজি হারে সিঙ্গল সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিলে কম্পোষ্টের মান ও উদ্ভিদ খাদ্যগুণ বাড়বে। শুরু থেকে ৩ মাস পরে গর্ত থেকে সমস্ত পচা সার বের করে এনে মাটির উপরে ঢিবি করে (৩/৪ টি) তাতে গোবর জল ছিটিয়ে আবার কাদামাটি লিপে দিতে হবে। এর ৩/৪ মাসের মধ্যে জমিতে দেবার মত কম্পোষ্ট তৈরি হয়ে যাবে।

প্রয়োজন অনুসারে কম্পোষ্ট তৈরির গর্ত ছোট বড় করে নেওয়া যেতে পারে। নিচে একটি আদর্শ গর্তের ছক দেওয়া হল। গর্তের সার প্রতি স্তরে যাতে ভালভাবে পচে তার জন্য স্টার্টার হিসাবে গোবর গোলা জল ও গো-চোনা ব্যবহার করা যায়। এসবের অভাবে ভাল পচা সারও এজন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। গো-মূত্রে গোবর অপেক্ষা অনেক বেশি নাইট্রোজেন থাকে। গো-মূত্র দিলে গোবর বা আবর্জনা শীঘ্র পচে। শুকনো আবহাওয়ায় মাঝেমাঝে গাদার উপর জল ছিটিয়ে দিতে হবে।

ছক (২৮) **কম্পোষ্ট তৈরির আধুনিক পদ্ধতি ঃ**



(ক) কাদামাটি ও গোবর জল দিয়ে লিপে দেওয়া স্তরটি সবার উপরে। ৩/৪ ইঞ্চি পুরু।

(খ) গোবর গোলা জল ও গো-চোনা দিয়ে তৈরি স্টার্টার স্তর। ১-২ ইঞ্চি পুরু।

(গ) গর্তের মধ্যে পচান সারের (কম্পোস্ট) স্তর। ১-২ ফুট পুরু।

কম্পোষ্ট তৈরির উপাদান ঃ

এই কম্পোষ্ট তৈরির জন্য প্রধান উপাদান হিসাবে গোবর এবং খামার, গোয়াল বা খাটালের আবর্জনা, খড়কুটো, ধানের আগড়া, আখের ছাড়ান পাতা, নিড়ানির আগাছা, শাক-সবজির ফেলনা, কচুরিপানা, বনকলমী, জয়ন্তী, আকন্দ, বনফুল, গ্লাইরিসিডিয়া, ধঞ্চে, শন, সয়াবীন, অড়হর, মুগ গাছ, গো-চোনা মেশান মাটি ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুপার ফসফেট প্রয়োগ করা যায়।

গোবর কম্পোষ্ট ঃ

গোবর খুব উৎকৃষ্ট সার। তবে গোবর বা গবাদি পশুর গোময় না পচিয়ে ব্যবহার করা উচিত না। তাজা বা টাটকা গোবর জমিতে প্রয়োগে নানারকমের পোকা মাকড়ের উপদ্রব হতে পারে। তাছাড়া টাটকা গোবরের তেজ চারা গাছ বা নরম গাছ অনেক সময় সহ্য করতে পারে না। এজন্য সব সময় গোবর পচিয়ে কম্পোষ্ট করে ব্যবহার করা উচিত।

গোবর পচাবার জন্য সংগৃহীত গোবর অনুপাতে একটি গর্ত করে তার তলায় ইট বিছিয়ে তার উপর ১ ইঞ্চি পুরু ছাই ছড়িয়ে দিয়ে গোবর ঢেলে দিতে হবে। ৫/৬ মাস গর্তে থাকার পর এই সার পচে কম্পোষ্ট হলে জমিতে প্রয়োগ করা যাবে। প্রয়োজনে এ ধরণের একাধিক গর্ত করে গোবর পচিয়ে গর্ত করে নিতে হবে।

গোবরের চেয়ে ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগলের নাদ বেশি তেজি সার। পাখির বিষ্ঠা বা মল আরো ভাল সার। পায়রা, হাঁস, মুরগীর বিষ্ঠা বা মল সংগ্রহ করে পচিয়ে জমিতে দিতে পারলে ভাল কাজ পাওয়া যাবে। শাক-সবজি, ফুল ও চারা গাছের পরিচর্যায় এই সার খুবই কাজের। পোলট্রি সার চাষে এখন খুবই ব্যবহার হচ্ছে।

ছক (২৯) **গোবর সারে উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ (শতকরা হিসাবে) ঃ**

নমুনা	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
টাটকা গোবর	০·৫-০·৭৫	০·২-০·৩	০·৪-০·৭
গোবর গ্যাস প্লান্ট থেকে নির্গত গোবর সার	১ ৫-৩·৫	১·১-২·০	০·৮-১·২

গো-চোনা সার ঃ

অনেকের মতে গো-চোনা বা গবাদি পশুর মূত্র মিশ্রিত গোবর লবণাক্ত হয় এবং তা ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক। এটা খুবই ভুল ধারণা, বরং গোবর অপেক্ষা গো-চোনা আরো বেশি ভাল সার। এছাড়া ঘোড়া, গাধা, গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগলের মূত্র খুবই তেজি সার। সদ্য ত্যাগ করা মূত্র সার হিসাবে ব্যবহারে নরম গাছপালা ঢলে পড়তে পারে। এজন্য এই মূত্র সারে ১০/১২ গুণ জল মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। তবে এইসব গবাদি পশু কখন মূত্র ত্যাগ করবে না জানার জন্য তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য খাটাল বা গোয়ালে কিছু শুকনো ছাই, খড় বা মাটি ছড়িয়ে রাখলে মূত্র-ত্যাগের পর এরা শুষে নেবে। সপ্তাহে ২/৩ বার ঐসব মূত্রমিশ্রিত ছাই.মাটি সংগ্রহ করে রেখে এর তেজ কমলে ১৫/২০ দিন বাদেই জমিতে ব্যবহার করা যাবে। টাটকা মলমূত্র ব্যবহারে ফসলে পোকা মাকড়ের উৎপাত ঘটতে পারে। এজন্য পচিয়ে নিলে ভাল হয়।

গো-চোনা সংরক্ষণ ঃ

আগেই বলেছি গো-চোনা একটি উৎকৃষ্ট সার। অথচ এই মূল্যবান সার প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে যায়। এটা সংরক্ষণের জন্য গরুর গোয়াল বা খাটালের মেঝে পাকা করে তা থেকে একটি নালা করে এক পাশে পাকা গর্ত করা দরকার। মেঝে পাকা করতে না পারলে সামনের দিক উঁচু ও পিছনের দিক নিচু করলে গো-চোনা গড়িয়ে এসে নালা দিয়ে নির্দিষ্ট গর্তে এসে পড়বে। এতে কিছু চোনা নষ্ট হবে মাত্র। ঐ গর্ত থেকে পাত্র দিয়ে

চোনা তুলে কম্পোষ্টে প্রয়োগ করা যাবে। এটা গাই, বলদ, মোষ সবার ক্ষেত্রেই ভাল ব্যবস্থা।

গো-চোনা সংরক্ষণের আর একটি ভাল উপায় হল গরু বা মোষগুলি যখন খাটালে থাকে তখন একটি টিনের হুদিকে দড়ি দিয়ে সেটি বলদের পেটে বেঁধে দিলে গোচনা ধরে রাখা যায়। তবে এ ব্যবস্থা শুধু বলদ, ষাঁড় বা পুরুষ মোষের ক্ষেত্রেই উপযুক্ত যাদের মূত্রদ্বার পেটের তলায়। এই সংগৃহীত চোনা রোজ দু মাস ধরে কম্পোষ্টের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। কম্পোষ্টের সঙ্গে এই গো-চোনা মিশ্রণের অন্তত ৩/৪ মাস বাদে জমিতে প্রয়োগ করা উচিত।

মলমূত্র থেকে সার :

শহরে স্যানিটারি পায়খানার অভাব নেই। এই পায়খানার জলকে বড় ট্যাঙ্কে সংগ্রহ করে কিছু দিন বাদে থিতিয়ে যাওয়া পুরু পাঁককে জৈবসার হিসাবে ও উপরের জলকে তরল সার হিসাবে বা সেচের জলে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা যাবে। এইসব সারে ক্ষতিকারক জীবাণু থাকতে পারে। কাজেই এই সার জমিতে প্রয়োগের আগে গাঁজন ও জারণ প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে নেওয়া দরকার। এতে শতকরা ১.৫ থেকে ৩.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। পশুখাদ্য চাষে এই সার খুব উপযুক্ত।

প্রস্রাব সার :

গান্ধীজী প্রস্রাব সারকে হীরা সার বলতেন। আর পায়খানার সার হল সোনা সার। জমিতে সোনা ফলান যায় যদি এদিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সার তৈরি করা যায়। গোপুরী পায়খানার সাহায্যে মল সার তৈরি করা সহজ হয়। প্রস্রাব সঠিকভাবে সংগ্রহ করে তা অন্যান্য জৈব সারের সঙ্গে মিশ্রণ করে প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে ঐ মিশ্রণ সার ভাল করে না পচলে জমিতে প্রয়োগ করা যাবে না। (উপরে উন্নত জৈব কম্পোষ্ট দেখুন)।

চায়ের ব্যবহৃত পাতা থেকে সার :

শহর-শহরতলি ও গ্রামে-গঞ্জে প্রায় সর্বত্রই এখন চায়ের দোকান আছে। এছাড়া বাড়িতেও চায়ের ব্যবহার এখন ব্যাপক। চা ছেকে নেবার পর এইসব পাতা দোকানে বা বাড়িতে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হয়। অথচ এইসব ব্যবহৃত পাতা সংগ্রহ করে পচিয়ে

নিলে ভাল সার হতে পারে। দোকানে বা বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট টিন বা মাটির পাত্রে সংগ্রহ করে অন্যত্র একটি মাটির পাত্রে বা গর্তে ৩-৪ মাস পচিয়ে নিলেই তা চাষের জমিতে প্রয়োগ করা যায়। না পচিয়ে এ জিনিস আদৌ ব্যবহার করা উচিত না। শাক-সবজি, ফল, ফুল চাষে এই সার ভাল কাজ দেয়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব ব্যবহৃত চা-পাতা বৃথাই নষ্ট হয়। গোবর বা মিশ্রসারের সঙ্গে মিশিয়েও এই সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

প্রাণিজ সার ঃ

পশু-পাখির মরা দেহ পচিয়ে উৎকৃষ্ট সার তৈরি করা যায়। মৃত পশু-পাখির দেহ কোন গর্তে কিছু দিন মাটি চাপা দিয়ে রাখলে তা পচে-গলে সারে পরিণত হয়। একই ভাবে নিহত ও মৃত পশুর খুর, শিং, রক্ত, মাংস, নাড়িভুঁড়ি, হাড় সবই উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

এই জাতীয় জৈবসারে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কম থাকায় ফসল শীঘ্রই নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। পশুর শিং ও খুরের গুঁড়োয় শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। হাড় কলে পিশে গুঁড়ো করে নিলে ভাল সার হয়। মূলজ সবজি ও ফুল চাষে এই সার খুব কাজের। নিহত বা মৃত পশুর মাংস, নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি থেকে তৈরি জৈবসারে শতকরা ৪ থেকে ১০ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে।

হাড়গুঁড়ো ঃ

সার হিসাবে হাড়গুঁড়োর ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। ফসফেটঘটিত সার হিসাবে সরাসরি বা মিশ্রসার হিসাবে এর ব্যবহার খুবই ব্যাপক। তবে অতি সম্প্রতি রাসায়নিক সারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এর ব্যবহার কমে আসছে। এতে শতকরা ২০ ভাগ ফসফরাস ও ২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকার কথা। অম্ল মাটিতে প্রয়োগের পক্ষে এটি একটি উত্তম সার। মিহি গুঁড়ো করে মাটিতে এ সার প্রয়োগ করলে ভাল কাজ পাওয়া যাবে। তবে হাড়গুঁড়ো মাটিতে মিশতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। এঁটেল বা পলিকাদা মাটির তুলনায় বেলে বা বেলে দোঁয়াশ মাটিতে এ সারে ভাল কাজ দেয়। হাড়গুঁড়ো কাঁচা অবস্থায় বা ভাপিয়ে নিয়েও জমিতে প্রয়োগ করা যায়। ভাপিয়ে নিলে নাইট্রোজেনের ভাগ একটু কমে যায় তবে ফসফরাসের ভাগ বেড়ে গিয়ে শতকরা ২২-এ দাঁড়ায়। ভাপিয়ে প্রয়োগ করলে তাতে সার ব্যবহারকারীর লাভই হয়।

তবে এ সার মূলসার হিসাবে প্রয়োগ করতে হলে বীজ বা চারা রোয়ার ৩/৪ সপ্তাহ আগে জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালকরে মিশিয়ে দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করলে এ সারে ভাল কাজ দেবে না।

ব্লাড মিল ঃ

রক্ত বা ব্লাড মিল আজকাল সার হিসাবে সমাদর পাচ্ছে। কসাইখানা থেকে পাওয়া প্রতি ১০০ পাউণ্ড রক্তকে ২ আউন্স কিউপ্রিক সালফেটে মিশিয়ে স্ন্যাণ্ডবাথের উপর শুকনো করে নেওয়া সারে শতকরা ১০-১২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই সার শীঘ্র গাছপালা গ্রহণ করতে পারে। এই সার অল্প পরিমাণে সংরক্ষণেরও পথ আছে। টিন বা লোহার পাত্রে কাঁচা রক্ত ধরে রেখে এর ৩/৪ গুণ চুণ মিশিয়ে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে চাষে প্রয়োগ করা যায়।

ফিস মিল ঃ

পচা মাছেও প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। পচা মাছ অন্যকোন স্থানে গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে পচিয়ে সার করে চাষে প্রয়োগ করা যায়। সমুদ্র পাড়ে প্রায়ই প্রচুর মাছ পচে নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এসব মাছ শুকিয়ে রাখলে ভাল সার হতে পারে। গো-খাদ্য বা পোলট্রির খাদ্য তৈরিতে ফিসমিল লাগে। ধান, শাক-সবজি, ফল, ফুল বিশেষকরে নারকেল বাগানে উৎকৃষ্ট জৈবসার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। মাছের প্রকারভেদে এইসব সারে শতকরা ৪ থেকে ১০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। চারা বসানোর সময় বা চাপান সাররূপে শুকনো মাছকে গুঁড়ো করে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। মাছপচা জলও ফুল ও শাক শবজি চাষে ভাল সারের কাজ করে।

পোলট্রি সার ঃ

মুরগির বিষ্ঠা সার বা মুরগির লিটার সার নামেও এ সার বেশ পরিচিত। মুরগির ঘরে বিছান বিচালি এদের বিষ্ঠার সঙ্গে মিশে চমৎকার সার তৈরি হয়। ৬ থেকে ১ বছরের মধ্যে অনবরত মুরগীর মূত্র ও বিষ্ঠা এর লিটারের বিচালির সঙ্গে পচে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। পরে এ থেকে এ্যামোনিয়া ও তাপ তৈরি হয়। গোবর সারের চেয়ে এই সার প্রায় ৩/৪ গুণ শক্তি সম্পন্ন। গোবর সার থেকে গড়ে যেখানে এন পি-কে পাওয়া যায় যথাক্রমে শতকরা ০.৫, ০.২৫ এবং ০.৫ ভাগ সেখানে পোলট্রি সার থেকে পাওয়া যায় শতকয়া ১.৪, ১.৬ এবং ০.৮ ভাগ এন-পি-কে।

১টন পরিমাণ এই সারে প্রায় ১১৩ — ১৪৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান নাইট্রোজেন (গড়ে ২৮ কেজি নাইট্রোজেন), ১১১—১৩৩ কেজি সুপার ফসফেট এর সমান P_2O_5 (গড়ে ২০ কেজি ফসফরাস) এবং প্রায় ৪৫ কেজি পটাশিয়াম এর সমান K_2O (গড়ে ২০ কেজি পটাশ) থাকে।

এই সারের উৎকর্ষ আরো বাড়াতে প্রতিটন তাজা সারে ৪৫ কেজি হারে সুপার ফসফেট প্রয়োগ করলে এতে ফসফরাসের পরিমাণ বাড়ে, নাইট্রোজেন ধরা পড়ে, দুর্গন্ধ দূর হয় এবং আগের উর্বরতা বজায় থাকে। এতে কিছু চুণ মিশিয়ে দিলে সার ও লিটার উভয়েরই উন্নতি হয়। লিটারে মাছির উৎপাত কমে খাচা শুকনো ও পরিষ্কার থাকে।

খইল :

খইল একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। আমাদের দেশে প্রায় ২ মিলিয়ন টন খইল বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎস থেকে প্রতি বছর পাওয়া যায়। এতে শতকরা ৩ থেকে ৯ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। শাক-সবজি ও পান চাষে খইল সার হিসাবে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সরষে, চীনাবাদাম, তিল, তুলা, তিসি, নিম, নারকেল, রেড়ি, করঞ্জা ইত্যাদি নানা ধরণের পদার্থ থেকে খইল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রেড়ি, চীনাবাদাম ও সরষের খইলের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। তবে সরষে ও চীনাবাদামের খইল গো-খাদ্য হিসাবে বেশী ব্যবহার হয়।

কাঁচা খইল ফসলে ব্যবহার করা উচিত না। খইল পচবার সময় এ থেকে উত্তাপ নির্গত হয়। কাজেই ফসলে প্রয়োগের পর খইল পচলে এর উত্তাপে গাছপালা, শস্য নিস্তেজ করে এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। এজন্য জমিতে প্রয়োগ করার আগে খইল, কোন পাত্রে ভিজিয়ে পচিয়ে নেওয়া উচিত। পচাতে অসুবিধা থাকলে খইল গুঁড়ো করে জমিতে শেষ চাষের সময় সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এর পর একটা সেচ ও বৃষ্টি পেলেই জমিতে দেওয়া খইল পচে যাবে ও তেজ অনেকটা কমে যাবে। এইভাবে জমিতে ১৪।১৫ দিন পচবার পরই চারা রোয়া করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম হবে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে খইল পচতে সময় কম লাগে।

কাঠের ছাই :

কাঠের ছাইও একটি ভাল উদ্ভিজ সার। এতে যথেষ্ট পরিমাণ পটাশ ও ফসফেট আছে। উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশে ধানের জমির লম্বা খড় জমিতে পুড়িয়ে সার করা হয়। পোকা-মাকড়ও এতে জমিতে বাড়তে পারে না। মূলজ শাক-সবজিতে কাঠের ছাই খুব ভাল সার। কপি চাষের জমিতে চারা বসাবার মাসখানেক আগে জমিতে কাঠের ছাই

প্রয়োগ করলে ফসল ভাল হয় এবং পোকামাকড়ের উপদ্রবও কম হয়। এছাড়া শ্যাওলা, কচুরি ও অন্যান্য পানা পোড়ান ছাই শাক সবজি চাষে ভাল সারের কাজ করে।

পাঁকমাটি ঃ

পাঁকমাটি একটি বহু প্রচলিত সার। পানবোরোজ ও শাক-সবজির জমি তৈরিতে পাঁকমাটির মিশ্রণ দিলে জমি খুবই উর্বর হয়। গাছপালার পাতা, ডালপালা, জলজ উদ্ভিদের ও জলজন্তুসমূহের গলিত অংশ বা ধ্বংসাবশেষ থেকেই পুকুর, খাল, বিল বা ড্রেনের পাঁক তৈরি হয়। প্রচুর খনিজ ও প্রাণিজ উপাদানে এই পাঁক সমৃদ্ধ হয়। তবে সাধারণ জমিতে সার বা চাপান সার হিসাবে ব্যবহারের আগে এই সার খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্রয়োগ করা উচিত। রোদে শুকিয়ে নিলে এর মধ্যে দূষিত পদার্থ থাকলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। নারকেল, কাঁঠাল, নোনা, লিচু, আম ইত্যাদি ফল গাছের গোড়ায় বছরে দুবার (ভাদ্র আশ্বিন ও চৈত্র বৈশাখ) প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সবুজসার ঃ

উদ্ভিদখাদ্যের জন্য সবুজসার বা (Green Manure) গ্রীণ ম্যানুওর ইদানীং খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চাষের জমি তৈরি করার আগে ধঞ্চে, গ্লাইডিসিডিয়া, শন, বরবটি ইত্যাদি ফসল জমিতে চাষ করা হয়। গাছে ফল আসার ঠিক আগেই লাঙল-মই দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাটিতে কয়েকদিন এইসব শস্য পচে গেলে সবুজসার হয়। মাটির উৎপাদিকা শক্তি সবুজসার প্রয়োগে খুব বাড়ে। প্রতি বছর সবুজ সার জমিতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ২/১ বছর পরপর দিলেই হল। তবে জমিতে সবুজসার চাষ করার বড় অসুবিধা হল এর যেকোন একটি শস্য চাষ করার জন্য কমপক্ষে ১ থেকে ২ মাস জমিকে আটকে রাখতে হয়। নিবিড় চাষ এলাকায় এতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

পাতা সার ঃ

গাছপালার ঝরে পড়া পাতা দিয়ে ভাল পাতাসার বা (leaf mould) লিফ মোল্ড হতে পারে। পাতাসার একটি উৎকৃষ্ট জৈবসার। নার্সারীর বীজতলা এবং ফুলচাষে পাতাসারের ব্যাপক প্রয়োগ হয়। এঁটেল বা বালি মাটিকে আরো ভালভাবে চাষের কাজে লাগাবায় জন্য পাতাসারের প্রয়োগ বাড়ছে। ৬ ফুট লম্বা, ৪ ফুট পাশে ও ৪ ফুট

গভীর একটু উঁচু জায়গায় একটি গর্ত করে শুকনো পাতা ৭/৮ মাস ধরে পচালে পাতাপচা সার তৈরি হবে। সব রকম গাছের পাতা, আম, জাম, কাঁঠাল ও অন্যান্য বাগানের ঝরা পাতা গর্তে দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। গরমকালে পাতার উপর কিছু জল ছিটিয়ে দিলে গর্তের এইসব পাতা পচতে সুবিধা হবে। তবে পাতাসার তৈরির জন্য বাঁশ পাতা, তেঁতুল পাতা, কলাপাতা বা পেটো, ঝাউপাতা ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত না। কারণ এসব পাতায় কিছু পরিমাণে ক্ষার আছে।

পাতাসার ব্যবহার ঃ

বছর খানেক গর্তে পচার পর এইসার জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ফুল চাষে বা নার্সারীতে পচা-পাতা প্রথমে একটু শুকিয়ে, একটু গুঁড়ো করে, চালুনিতে ছেকে নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। চালুনিতে ছেকে পাতার না পচা অসমান বড় বড় অংশগুলি বাদ দিতে হবে। এইগুলি চাষের জমিতে ব্যবহার না করে আবার ভালকরে পচার জন্য গর্তে দিয়ে দেওয়া উচিত।

ধঞ্চে সার ঃ

সবুজসার তৈরি করতে ধঞ্চে বিশেষ স্থান নিয়ে থাকে। এই জাতীয় গাছের শিকড়ে একপ্রকার জীবাণুর সাহায্যে গুটির সৃষ্টি হয়। এই জীবাণুরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গুটিতে জমিয়ে রাখে। পরে অন্য শস্যকে উদ্ভিদখাদ্য যোগায়। ধঞ্চে দিয়ে সবুজ সার করার বড় সুবিধা হল এইগাছ শীঘ্র ও সহজে পচে এবং শীঘ্র মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটির উর্বরাশক্তি বাড়িয়ে দেয়।

ধঞ্চে খুব কার্যকরী ও সস্তা সবুজসার। এক বিঘা জমিতে ধঞ্চে চাষ করে কমবেশি প্রায় ৭০ মণ সবুজসার এবং প্রায় ২৫ পাউণ্ড নাইট্রোজন পাওয়া যাবে। আমন ধান চাষে ধঞ্চে সারকে ভালভাবে কাজে লাগানো যায়। আমন চাষের মাস দেড় দুই আগে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ২/১ বার লাঙল দিয়ে বিঘাপ্রতি ৩ কেজি বীজ বুনে দিতে হয়। ভাল ফলন পাবার জন্য বিঘাপ্রতি ১৭/১৮ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট বীজ বোনার আগে জমিতে দিলে ভাল হয়। বীজ রাখার জন্য পতিত জমি, জমির আইল, পুকুরের পাড়ে অল্প কিছু ধঞ্চে বীজ বুনে রাখা উচিত। এতে বীজ পেতে সুবিধা হয়। ধঞ্চে গাছ ৪/৫ ফুট বড় হলে জমিতে লাঙল চালিয়ে গাছগুলিকে শুইয়ে দিতে হবে। পরে এর উপর মই দিয়ে মাটিতে চাপা দিতে হবে। এই ধঞ্চে মাটিতে পচে গিয়ে ভাল সবুজ সার হবে এবং ফলে ঐ জমিতে অল্প রাসায়নিক সার দিলেই চলবে।

কচুরিপানা কম্পোষ্ট ঃ

গ্রামে-গঞ্জে এমনকি শহর ও শহরতলির খানা, ডোবা, খাল, বিল, পুকুরে কুচুরি পানার অন্ত নেই। একটু কষ্ট ও পরিশ্রম করলেই এ থেকে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কম্পোষ্ট সার তৈরি হতে পারে।

এই কম্পোষ্ট সেরা জৈবসার হিসাবে বেলে মাটিকে দো-আঁশ মাটিতে, এঁটেল বা কাদা মাটিকে হাল্কা নরম মাটিতে পরিণত করতে সাহায্য করে। এ সার মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে উপকারি জীবাণুদের কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেয়।

শতকরা ৩০ ভাগ জলীয় অংশ আছে এমন একটন কচুরি পানার কম্পোষ্টে প্রায় ১৪ কেজি নাইট্রোজেন (যা ৭০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ৩২ কেজি ইউরিয়ার সমান), প্রায় ৮ কেজি ফসফেট (যা ৫০ কেজি সুপার ফসফেটের সমান) এবং প্রায় ১৮ কেজি পটাশ (যা প্রায় ৩৬ কেজি মিউরেট অব পটাশের সমান) থাকে। এই সব এন-পি-কে ছাড়াও এতে আছে অনেক অপ্রধান ও অনুখাদ্য উপাদান, যেমন—আয়রণ, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, বোরণ, মলিবডেনাম ইত্যাদি।

এই কম্পোষ্ট তৈরির নিয়ম ঃ

হিপ মেথড এবং পিট মেথড এর মাধ্যমেই কচুরি পানার কম্পোষ্ট করা হয়। যেখানে মাটিতে গর্ত করা অসুবিধা সেখানে হিপ মেথড বা স্তূপ পদ্ধতিই ভাল।

হিপ মেথড—এই পদ্ধতিতে কচুরি পানা পচাতে গিয়ে দেখতে হবে বৃষ্টির জলে যাতে না ধুয়ে যায় তারজন্য উঁচু জায়গায় ছাউনির নিচে কচুরি পানার হিপ বা স্তূপ করতে হবে।

পিট মেথড বা গর্তে পচান পদ্ধতির জন্য মোটামুটি ৪ ফুট গভীর, ৪ ফুট চওড়া ও কচুরি পানার পরিমাণ অনুসারে ৩/৪ ফুট লম্বা পাকা, বা কাঁচা গর্ত করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক গর্ত করা যেতে পারে। গর্তের দেয়াল পাকা হলে ভাল হয়। তা না হলে দেয়াল পিটিয়ে শক্ত করে গোবর ও এঁটেল মাটি দিয়ে লেপে দিলে সারের খাদ্য উপাদান অপচয় কম হবে।

কচুরিপানা সংগ্রহ করে অন্তত একদিন জল ঝরিয়ে প্রথম স্তরে ১ ফুট উঁচু করে ঐ গর্তে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ১-২ ইঞ্চি পুরু করে গোবর বা কাদা মেশানো গোবর বা কম্পোষ্ট এর একটি স্তর স্টার্টার হিসাবে দিতে হবে। প্রথমবার ষ্টার্টার দেবার আগে

গর্তপ্রতি ৪০০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিলে পচন দ্রুত হবে। এরপর আর ১ ফুট কচুরিপানা ও তার উপর ১ স্তর স্টার্টার এইভাবে ৪/৫ টি স্তর হবার পর উপরটা গোবর কাদামাটি দিয়ে ২-৩ ইঞ্চি পুরু একটি প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাস দুএকের মধ্যে কচুরি পানা পচে অর্ধেক হয়ে নেমে যাবে। তখন কোদাল দিয়ে একবার উল্টে-পাল্টে দিলে পচন ক্রিয়া সর্বত্র সমান হবে। প্রয়োজনে ২/৩ টি স্তূপ বা গর্তের পচা কচুরিপানা একত্র করে আবার গোবর-মাটি দিয়ে মাস দুই ঢেকে রাখলেই ভাল কম্পোষ্ট তৈরি হবে এবং জমিতে প্রয়োগের উপযোগী হবে।

কচুরি পানা কম্পোষ্টে টাউন কম্পোষ্টের প্রায় দ্বিগুণ এবং আবর্জনা কম্পোষ্টের প্রায় ৪ গুণ উদ্ভিদ-খাদ্য উপাদান আছে।

নীল-সবুজ শৈবাল সার ঃ

এই সার উদ্ভিদখাদ্য হিসাবে এক নতুন দিগন্ত এনে দিয়েছে। রাসায়নিক সারের চড়া দামের কথা ভেবে নীল-সবুজ শৈবাল সারের প্রয়োগের কথা অনেক প্রগতিশীল চাষীই এখন ভাবছেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই সার ধানের জমিতে প্রয়োজনের শতকরা ৩০ ভাগ নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে।

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে অল ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনেটেড প্রোজেক্ট অন অ্যালগি কৃত্রিম উপায়ে মাটি থেকে শ্যাওলা উৎপাদনের জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। শৈবাল সার তৈরির জন্য এই সংস্থা শ্যাওলার স্টার্টার কালচার প্যাকেট চাষীদের কাছে বিক্রি করছেন।

শৈবাল সারের ভূমিকা ঃ

পরীক্ষায় দেখা গেছে ধানের জমিতে শ্যাওলার বংশবৃদ্ধি করে হেক্টরে ২৫ কেজির মত নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আনাবেইনা, অ্যানাবেইনপসিস, আউলোসিরা, নসটক ইত্যাদি জাতের শ্যাওলা ধান ক্ষেতে দেখা যায়। ধান ক্ষেতে লবণাক্ত ও ক্ষার মাটিকে শোধন করার জন্য এই সারকে সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ভারতে বর্তমানে ৪০ মিলিয়ন হেক্টর ধানের জমিতে এই জাতীয় শ্যাওলা চাষের সম্ভাবনা আছে। এই শ্যাওলা পাওয়া যায় ধান ক্ষেতে, পুকুরে, নদীর বা খালের বদ্ধ জলাশয়ে। মাটিতে, পাথরে এমনকি গাছের ডালেও পাওয়া যায়। ধান ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে থেকে জমিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এই সার প্রয়োগে ধান জমিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বাড়তি ফসল পাওয়া যায়।

শেওলা সার তৈরির নিয়ম ঃ

নীল সবুজ শেওলা সার তৈরির জন্য সারা দিন রোদ পড়ে এমন জমিতে ২ মিটার × ১ মিটার × ২০ সেঃ মিঃ আকারের গর্ত করে তাতে পলিথিনের আস্তরণ দিতে হবে যাতে মাটির মধ্য দিয়ে জল গড়িয়ে এসে এই মাটিতে না ঢোকে। শেওলা বীজের বংশ বৃদ্ধির জন্য এই গর্তে ৬-১০ সেঃ মিঃ জল জমা চাই।

৫ কেজি মাটির সঙ্গে ২০ গ্রাম ফোরাস সালফেট, ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট, ২৫ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ২৫ গ্রাম লাইম এতে মিশিয়ে দিতে হবে। এই মিশ্রণ যেন ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা থিতোতে পারে। পোকামাকড় মারতে এতে ২৫ গ্রাম ফিউরাডন দানা দিলে ভাল হয়। এরপর গর্ত প্রতি ২৫০ গ্রাম শেওলা (বীজ)- কালচার মিশিয়ে দিতে হবে। কালচার প্রয়োগের ৫ দিন পরেই শেওলার বৃদ্ধি নজরে পড়বে ও ১০/১৫ দিনের মধ্যে জলের ওপর শেওলার একটি স্তর ভাসতে দেখা যাবে। জল শুকিয়ে গেলে আবার জল দিতে হবে। ১৫ দিন পর গর্ত একবারে শুকিয়ে গেলে শেওলার স্তর তুলে রেখে দিতে হবে। এভাবে প্রতি গর্ত থেকে ৪-৭ কেজি পর্যন্ত শেওলা পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া ধাতব পাত্রে বা সিমেন্টের টবেও শেওলার বংশ বৃদ্ধি করা যায়। এজন্য ৯×৬×৩ বা ৪ ফুট আকারের পাত্র চাই। এই পাত্রে প্রথমে গুঁড়ো মাটি ও পুকুরের তলানি মাটি বিছিয়ে তার ওপর ৩ ইঞ্চি জল রাখতে হবে। প্রথমে এতে ১৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ৩০ গ্রাম লাইম ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। পোকা-মাকড় দমনের জন্য ২৫ গ্রাম (কারবোফুরান) ফিউরাডন দানা মিশিয়ে দিতে হবে। এতে বীজ কালচার (শেওলা) ২৫০ গ্রাম প্রয়োগ করার ৭-১০ দিন বাদেই শেওলা তৈরি হবে। এবং ১৫ দিন বাদে শেওলার উপরের স্তর তুলে রোদে শুকিয়ে নিলেই প্রতি পাত্র থেকে ৫-৭ কেজি শেওলা পাওয়া যাবে।

শৈবাল সারের বীজ পাওয়া যাবে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র থেকে বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

জমিতে শেওলা প্রয়োগে লাভ ঃ

ধানের ভাল ফলন পেতে, জমির মাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং সার প্রয়োগের খরচ কমানর জন্য চাষীদের প্রতি হেক্টর ধান জমিতে ১০ কেজি হিসাবে শেওলা সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। পর পর ৩ বছর জমিতে এই সার প্রয়োগে স্বাভাবিক

ভাবেই শেওলার জন্মহার বাড়ে। এতে রাসায়নিক (বিশেষ করে নাইট্রোজেন) সার কম প্রয়োগে বেশি ফলন পাওয়া যায়। ফলে সার খরচও কমে।

এ-সার প্রয়োগে লবণাক্ত, ক্ষার মাটি শক্ত হয়। নীল সবুজ শেওলা সার প্রয়োগে মাটিতে ভৌতাবস্থার উন্নতি হয়। মাটিতে জৈব, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও জলকণা সংরক্ষিত হয়ে লবণাক্ত মাটি চুনামাটিতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক পরিমাণ শেওলা সার নাইট্রোজেন সারের সঙ্গে প্রয়োগ করে মাটিকে উন্নত করে ধানের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে।

শেওলা সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

ধান চারা লাগাবার ৩/৪ দিন পর হেক্টর প্রতি ১০ কেজি বা একর প্রতি ৪ কেজি শেওলা সার জলের উপর সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। শেওলা জমিতে যাতে বাড়তে পারে তার জন্য ঐ জমিতে ৫/৭ দিন জল ধরে রাখা দরকার।

অ্যাজোলা ঃ

এটি একটি ভাসমান জলজ ফার্ণ। অ্যানোবেইনা অ্যাজোলেই নামেও পরিচিত। এই অ্যাজোলা প্রতি ফার্ণ পাতার পেটের দিকে পাতার পিঠের লতির সঙ্গে বিশেষ ধরণের কোটরের মধ্যে বাস করে। নীল সবুজ শ্যাওলা ও এই অ্যাজোলা একসঙ্গে সৌরশক্তি দিয়ে মাটিতে বায়ুর নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এভাবে হেক্টরে প্রায় ৩৭ টন জৈব পদার্থ বছরে উৎপাদন করা সম্ভব। এর জীবাণু-কোষ শীঘ্র নষ্ট হয় বলে সংরক্ষণ ও বীজ সংগ্রহ সহজ হয় না। ফিলিপিনসের আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে এই অ্যাজোলা দিয়ে ২ সপ্তাহের মধ্যে হেক্টরে ৩০-৪০ কেজি নাইট্রোজেন সংগৃহীত হয়েছে। কটকের ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে হেক্টরে ১০ টন মত অ্যাজোলা প্রয়োগ করে ধানের ফলন বেশি পাওয়া গেছে যা ৩০ কেজি রাসায়নিক সার-প্রয়োগ করে পাওয়া যায়, আমাদের দেশেও এই অ্যাজোলা সারের সম্ভাবনা প্রচুর।

অ্যাজোলা প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

ধান জমি কাদা করার পর জল ঢুকিয়ে অ্যাজোলা সারা জমিতে সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। ধান জমিতে এটি একটি চমৎকার সবুজ সারের কাজ করবে। জমিতে প্রয়োগের ১০/১২ দিনের মধ্যেই অ্যাজোলা বেড়ে সারা জমি ছেয়ে যাবে। এ সময় জমিতে জল থাকলে অ্যাজোলা দ্রুত বাড়বে এবং জমিতে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন

যুক্ত হতে পারবে। এবার অ্যাজোলার সবুজ আস্তরণকে লাঙ্গল-মই দিয়ে কাদা করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

অ্যাজোলা কালচার বা বীজ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ধান গবেষণা কেন্দ্র বা কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যায়।

গোলা সার বা ফলিও ফিড ঃ

নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এবং অণুখাদ্য ও উদ্ভিদ হরমোনের মিশ্রণে তৈরি এই সারটি গাছপালার পক্ষে একটি সুষম সার। এটি বাড়িতেই তৈরি করে নেওয়া যায়। গাছের বাড় ও পুষ্টির জন্য অল্প মাত্রায় পাতায় প্রয়োগ করলে পাতার ছিদ্রপথ দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং গাছ শীঘ্র বাড়ে। বোড়ালের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় গোলাসার তৈরি করে বাজারে ছেড়েছেন। বাড়িতেও এটি তৈরি করা যায়। গাছে ফুল বা কুঁড়ি আসার মুখে প্রচুর ফসফরিক এসিড দরকার, তখন পাতায় এই সার প্রয়োগ করে ফুল, ফল, শাক-সবজির ওজন এবং বীজের আকার বাড়ান যায়। খরা এলাকার জমির জন্য এ-সার খুব উপযোগী।

এজন্য মরসুমী ফুল, শাক-সবজি, ফুলকপি, বাঁধাকপির মত দুর্বল প্রকৃতির গাছ-পালা রোয়ার ২/৩ দিন আগে বীজতলার চারায় খুব পাতলা করে এ-সার একবার প্রয়োগ করলে শিকড় তাড়াতাড়ি বাড়ে ও গাছ সবল হয়। এই সার মিশ্রিত জলে বীজ বা চারার গোড়া ভিজিয়ে গাছ পুতলে শীঘ্র মাটিতে ধরে।

কয়েকটি ফল, বিশেষ করে কলার কাঁদি, লাউ, কুমড়ো বা পেঁপের গায়ে প্রয়োগ করে দেখা গেছে সেগুলোর বাড় অনেক বেশি হয়। পাতায় প্রয়োগের ফলে এই সার ক্রমশ পাতা, শাখা-প্রশাখা, কাণ্ডকে পুষ্ট করে গাছের মূলের দিকে নামে। পাতার প্রাচুর্য সৃষ্টি না করেও কন্দজাতীয় ফসল—আলু, মূলা, বীট গাছের ইত্যাদির ওজন বাড়ায়। রাসায়নিক সারের মত এই সার মাটিতে অম্ল বা ক্ষার ভাব বাড়ায় না।

জীবাণু সার ঃ

রাইজোবিয়াম নামে এক ধরণের জীবাণু শুঁটি জাতীয় গাছের শিকড়ে বাসা বাঁধে ও গুটি তৈরি করে। এইসব জীবাণুরা মূলের গুটিতে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এই জীবাণুসার কোন রাসায়নিক পদার্থ নয়। এক প্রকারের জীবাণু। এইসব জীবাণুরা (ব্যাকটেরিয়া) বাতাসের নাইট্রোজেনকে গাছের গ্রহণযোগ্য

অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে এবং পরিবর্তে গাছ ব্যাকটেরিয়াকে শর্করা যোগান দেয়।

এজন্য প্রতি শস্য পর্যায়ে শুঁটি বা ডাল জাতীয় শস্যের যেমন মুগ, মুসুর, অড়হর, কলাই, খেসারী, ছোলা, সয়াবীন, চীনাবাদাম, মটর, বরবটি এর যে কোন একটি চাষ করা দরকার। কোন জমিতে নতুন ডাল চাষ করতে হলে রাইজোবিয়াম জীবাণু মাখিয়ে বীজ বুনতে হয়। ডাল চাষে জীবাণুসার ব্যবহার করে ভাল ফল পেতে হলে প্রয়োজনীয় ফসফেট সার দিতে হবে। প্রত্যেক ডালজাতীয় শস্যের জন্যই আলাদা জাতের রাইজোবিয়াম জীবাণু আছে।

জীবাণু সার ব্যবহার পদ্ধতি ঃ

ডাল বীজ আধ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে ছেঁকে একটি পাত্রে রাখুন। ১০০ গ্রাম চিনি বা গুড় ১ লিটার জলে মিশিয়ে কিছুক্ষণ আগুনে রাখলে আঠালো হবে। এই ঝোলা রস ভাল করে ঠাণ্ডা করার পর বিঘাপ্রতি ১০০-১২৫ গ্রাম জীবাণুসার ও প্রয়োজনীয় ডাল বীজ একত্রে ভালভাবে মিশ্রণ করে কিছুক্ষণ ছায়ায় শুকিয়ে নিন। লক্ষ্য রাখুন একত্রে জড়িয়ে না যায় ও এতে রোদ না পড়ে। তাহলে জীবাণু নষ্ট হয়ে যাবে। অম্ল মাটিকে পরিমাণমত চুন দিয়ে সংশোধন করে নেওয়া ভাল।

মনে রাখবেন—

(১) স্যাঁতস্যাঁতে ও রোদ যায় না এমন জায়গায় জীবাণুসার রাখবেন।

(২) জীবাণু মাখান বীজে যাতে রোদ না লাগে তার জন্য বিকালে রোদ কমলে বোনা উচিত।

(৩) জীবাণু মাখান বীজ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বোনা উচিত।

(৪) জীবাণু মাখার পর আর কোন ছত্রাকনাশক ওষুধ তাতে মাখান চলবে না।

(৫) জীবাণু সার ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যেই ব্যবহার করা উচিত।

(৬) কোন্ ডাল চাষে কোন্ প্রজাতির রাইজোবিয়াম লাগবে তা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী বা বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। কারণ ডাল অনুসারে রাইজোবিয়ামের বীজও আলাদা হবে।

ছক (৩০) **জীবাণুসার প্রয়োগে সঞ্চিত নাইট্রোজেনের পরিমাণঃ**

শস্যের নাম	বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে সঞ্চিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ
(১) মুসুর	৫৬ কেজি থেকে ৭৭ কেজি ইউরিয়ার সমান
(২) অড়হর	৬৫ " ৯০ " " "
(৩) বরবটি	১৫৬ " ২৪০ " " "
(৪) সয়াবীন	৭০ " ১২৪ " " "
(৫) চীনাবাদাম	৭২ " ১১২ " " "
(৬) ছোলা	১৫৫ " ২৭০ " " "
(৭) মটর	৪৬ " ৭০ " " "
(৮) সীম	১২৪ " ১৯০ " " "
(৯) ডাল জাতীয় পশুখাদ্য	১৫০ " ৭০০ " " "

এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের জমিতে প্রায় ১ লক্ষ টন ইউরিয়ার সমান নাইট্রোজেনের ঘাটতি রোধ করা যায়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি প্রায় ৮৫ কেজি নাইট্রোজেন ডাল জাতীয় (শিম্ব) শস্য নিজেই গ্রহণ করে ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

জীবাণুসার পাবার ঠিকানা ঃ

(১) রাষ্ট্রীয় গবেষণাগার (কৃষিবিভাগ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৩০-এ, নেতাজী সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০৪০

(২) নডিউল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পোঃ মোহনপুর জেলাঃ নদীয়া।

(৩) ডাল ও তেল শস্য বীজ গবেষণাগার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ।

(৪) বসু বিজ্ঞান মন্দির, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

এছাড়া সার বিক্রেতাদের কাছেও পাওয়া যেতে পারে।

ছক (৩১) **জৈবসারে উদ্ভিদখাদ্যের** (Nutrients) **শতকরা পরিমাণ :**

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ K_2O
(ক) ভারি ধরণের জৈব সার			
(১) গোবর সার	০.৫	০.২৫	০.৫
(২) টাউন কম্পোষ্ট	১.০	১.০	১.০
(৩) সুপার কম্পোষ্ট	১.০	১.০	১.০
(৪) আবর্জনা সার	০.৫	০.৪	০.৫
(৫) গো মূত্র	১.২	০.০১	১.৩
(৬) কলকাতা স্লাজ	০.৮	১.২	১.৮
(৭) গোবরগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে নির্গত গোলাসার	১.৫-৩.৫	১.১	০.৮
(৮) কয়লার ছাই	—	—	৪.৭০
(৯) ঘুটের ছাই	—	—	২.৫০
(১০) গো-চোনা	১.০০	—	০.৬০
(১১) প্রস্রাব	০.৬০	০.১৭	০.২০
(১২) ঘোড়ার মূত্র	১.৩	—	১.৪
(১৩) ভেড়ার "	১.৬	—	১.৯
(১৪) গরুর তাজা মল	০.৪	০.২	০.২
(১৫) ঘোড়ার " "	৩.৪	০.৩	০.৩
(১৬) ভেড়ার " "	০.৬	০.৫	০.৬
(১৭) হাঁস মুরগীর "	১.৪	১.৬	০.৮
(১৮) ক্ষেতের আবর্জনা সার	০.৯	০.৬	১.১
(খ) খইল সার			
(১) সরষের খইল	৫.০	১.৮	১.১
(২) বাদাম "	৭.০	১.৫	১.৩
(৩) রেড়ির "	৪.০	১.৮	১.০
(৪) তিলের "	৬.২	২.০	১.২

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ K_2O
(৫) নিমের খইল	৫.২	১.০	১.৪
(৬) তিসির "	৫.৫	১.৪	১.২
(৭) মহুয়া "	২.৫	০.৮	১.৮
(৮) তুলা বীজ "	৬.৯	৩.১	১.৬
(৯) করঞ্জ "	৪.০	০.৯	১.৩
(১০) নারকেল "	৩.৪	১.৫	২.০
(১১) নাইজার "	৪.৭	১.৮	১.৩
(গ) সবুজ সার (তাজা)			
(১) ধঞ্চে	০.৬	—	—
(২) লোবিয়া, বরবটি	০.৭	০.২	০.৬
(৩) ক্লাস্টার বিন, অন্যান্য বিন	০.৩	—	—
(৪) শণ	০.৭	০.১	০.৫
(৫) মুগ কলাই	০.৭	০.২	০.৫
(৬) মাস কলাই	০.৮	০.২	০.৫
(৭) কচুরি পানা	১.৯৬	০.৬২	৪.৩৫
(ঘ) প্রাণীদেহ থেকে প্রাপ্ত সার			
(১) ফিস মিল (মাছের গুঁড়া)	৬.০	৫.০	০.৫
(২) ব্লাড মিল (শুষ্ক জমাট রক্ত)	১০.০	১.২	০.৭
(৩) হুফ এ্যাণ্ড হর্ন মিল (খুর ও শিং)	১৪.০	১.০	—
(৪) পোলট্রি সার	১.০	১.৪	০.৮
(৫) বোন মিল (হাড় গুঁড়া)	৩.০	২০.০	—
(ঙ) অন্যান্য :			
(১) বিচালি	০.৪	০.৩	০.৪
(২) বাদাম গাছের পরিত্যক্ত অংশ	১.৭	০.৪	১.৪
(৩) কলা শুকনা	০.৬	০.১	১.০

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N)	ফসফেট (P_2O_5)	পটাশ K_2O
(৪) গম (গাছের পরিত্যক্ত অংশ)	০.৫	০.১	১.১
(৫) ধান "	০.৪	০.১	১.৭
(৬) আখ "	০.৪	০.১	০.৬
(৭) ভূট্টা "	০.৪	১.৬	১.৭
(৮) অড়হর "	১.১	০.৬	১.৩
(৯) জোয়ার "	০.৪	০.২	২.২

বিঃ দ্রষ্টব্যঃ নিম্নতম শতকরা গড় উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ দেওয়া হল। সারের উৎকর্ষ অনুসারে উদ্ভিদ-খাদ্যের শতকরা পরিমাণ সামান্য বাড়তে বা কমতে পারে।

অধ্যায় ১২

সোরা ও চুন ঃ

সোরা একটি বিশেষ ধরণের সার। ভারতে অনেক জায়গায়ই সোরা উৎপন্ন হয়। সোরা ছাইয়ের মত জমিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী থেকে কাজ করে না। জমিতে অস্থায়ী হলেও মাটিতে প্রয়োগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে। বীজ বা চারা রোয়ার পর জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে জল সেচ করা দরকার নাহলে বিশেষ কোন কাজ এ-থেকে পাওয়া যায় না।

চুন একটি চমৎকার খনিজ সার। অম্ল জমিতে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। মাটির বিক্রিয়া ও গ্রথন এই ছুটি বিষয় বিচার করে চুন জাতীর পর্দার্থের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। দীর্ঘ কাল পড়ে থাকা জমি চাষ করলে ভাল করে চষে তাতে বিঘাপ্রতি ৫০/৬০ কেজি চুন গুঁড়ো করে প্রয়োগ করা উচিত। অবশ্য মাটি পরীক্ষা করে চুনের প্রয়োগের পরিমাণ ঠিক করা প্রয়োজন। প্রতি ৪/৫ বছর পরপরই চুন জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। চুন দিয়ে মাটির অম্লত্ব শোধন করে সার প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা বাড়ে ও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। ডালামাইট, পোড়া চুর্ণ, ঘুটিং চুণে, বেসিক স্ল্যাগ ইত্যাদি চুন হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয়।

চুন প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

মাটিতে চুন ব্যবহার করে মাটির pH এর মান ১ বাড়াতে যেমন ৫.০ থেকে ৬.০ করতে হলে কি পরিমাণ চুন মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে মাটির চরিত্রের ওপর। অর্থাৎ কি ধরণের মাটি, জৈব পদার্থের পরিমাণ মাটিতে কতটা আছে এবং কি ধরণের চুন ব্যবহার করা হবে তার ওপর। জৈব উপাদানযুক্ত মাটিতে এবং কাদা ও দোঁয়াশ মাটিতে বেলে মাটির চেয়ে বেশি চুন দরকার।

মাটিতে চুন প্রয়োগের সবচেয়ে ভাল সময় হল মাঠ থেকে ফসল তোলার পরই। এ কাজটি বীজ বা চারা রোয়ার ২/৩ মাস আগে করা দরকার, তাতে চুন জমির মাটির সঙ্গে মিশে ভাল কাজ করে। চুন প্রয়োগের পর সার প্রয়োগ না করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তবে ভুলেও কখনও রাসায়নিক সারের সঙ্গে চুন মিশিয়ে প্রয়োগ

করবেন না। কারণ চুন নাইট্রোজেনের গুণ নষ্ট করে দেয়। চুন প্রয়োগের অন্তত ২ মাস বাদে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত।

কোন কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটি অম্লাত্মক হয়ে যায়। এজন্য চুনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ নিচের ৩২ নং ছক দেখে বের করা যাবে।

ছক (৩২) **মাটির অম্লত্ব সংশোধনে প্রয়োজনীয় চুনা-পাথরের পরিমাণ ঃ**

জলবায়ু ও মাটির প্রকৃতি	চুনা পাথরের পরিমাণ টন / একরে		
	পি· এইচ ৪·০ থেকে	পি· এইচ ৪·৫ থেকে	পি· এইচ ৫·৫ থেকে
(১) **উষ্ণ-আর্দ্র সমতল এলাকা ঃ**			
বেলে ও দোয়াঁশ বেলে,	১·৫	১·২	০·৫
বেলে দোয়াঁশ,	—	২·০	১·০
দোয়াঁশ ও পলি দোয়াঁশ	—	৩·৫	৩·০
কাদা দোয়াঁশ	—	৫·০	৩·০
(২) **ঠাণ্ডা আবহাওয়াযুক্ত পাহাড় এলাকা ঃ**			
বেলে ও দোয়াঁশ বেলে	৩·০	২·০	১·০
বেলে দোয়াঁশ	—	৩·০	২·০
দোয়াঁশ ও পলিদোয়াঁশ	—	৪·৫	৩·০
কাদা দোয়াঁশ	—	৬·০	৩·৫
(৩) **উপত্যকা এলাকা ঃ**			
জৈব ও জলমগ্ন	৯·০	৭·০	৪·৫

অধ্যায় ১৩

সার প্রয়োগে দক্ষতা ঃ

দক্ষতার সঙ্গে সার ব্যবহার ঃ

সারের কার্যকারিতা নির্ভর করে বিভিন্ন উদ্ভিদ উপাদান সঠিক ভাবে জমিতে প্রয়োগের উপর—(১) মাটি ও শস্যের প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ (২) সঠিক সময়ে (৩) সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ। এ ছাড়া মাটি ও শস্যের উপযোগী সঠিক সারটিও এজন্য নির্বাচন করতে হবে। এসব করতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

(ক) সারের সঠিকমাত্রা ঃ

বিভিন্ন ধরণের ফসলে বিভিন্ন মাত্রার খাদ্য উপাদান প্রয়োজন। বিভিন্ন শস্য তাদের প্রয়োজন অনুসারে মাটি থেকে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করে সব চেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে ঐ ফসলটির প্রয়োজন ও মাটির উৎকর্ষ অনুসারে।

শস্য ও মাটি অনুসারে রাজ্য সরকার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলি ও সরকারি সার সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রায় প্রতি বছরই সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগের একটি সংহত (সুপারিশ) নির্দেশিকা প্রকাশ করে থাকে। বিভিন্ন জেলার সরকারি ও বেসরকারি খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের এই মাত্রা ঠিক করা হয়। প্রতি বছরই এই মাত্রার কিছু না কিছু পরিবর্তন হয় আরো অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে। বিভিন্ন জেলার মাটি এমনকি একই জেলার মধ্যে নানা রকম মাটি থাকার জন্য এই বারোয়ারী মাত্রায় সার প্রয়োগ করে চাষী পুরো লাভ পাবেন না এবং সারের অপচয় রোধ করতেও পারা যাবে না। এজন্য মাটি পরীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে সার ও সারের মাত্রা ঠিক করা উচিত।

(খ) সার প্রয়োগের সঠিক সময় ঃ

খামারের আবর্জনা সার বা সবুজ সার জমিতে বীজ বোনার অনেক আগেই প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঐ সার মাটিতে পচে মিশে যায় এবং গাছপালা তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং চাষের ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ আগে আবর্জনা সার জমিতে প্রয়োগ করা দরকার। ধান চাষের জন্য ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের ধঞ্চে ধান চারা রোয়ার আগেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে যেমন, তেমনি ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ আগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে প্রায় একই ফল লাভ হয়। তবে একটু বেশি বয়সের ধঞ্চে গাছ পচতে দেরি হয়। এজন্য চারা রোয়ার ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ আগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বেশি লাভ হয়। কারণ বেশি বয়সের শক্ত ডালপালা পচতে একটি সময় বেশি লাগে। রোয়া ধানের মাঠে ধঞ্চে ১০/১৫ দিন পচবার পরও, ধান রোপণ করলে ক্ষতি হয় না।

রাসায়নিক সার ঃ

কি ধরণের, কি পর্যায়ের শস্য, তাদের খাদ্য, মাটির অবস্থা, কি ধরণের সার ইত্যাদির উপর এই সার প্রয়োগ নির্ভর করে।

এই সার প্রয়োগ করা যায় ঃ

(১) শস্য রোয়ার অনেক আগেই,
(২) বীজ বোনার সময় এবং
(৩) বীজ বোনা বা রোয়ার পর।

(১) শস্য রোয়ার আগে প্রয়োগ ঃ

কিছু ফসফেটঘটিত সার যেমন রকফসফেট, বেসিক স্ল্যাগে ইত্যাদি বীজ বোনার ২ থেকে ৪ সপ্তাহ আগে জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসতে এই সময় লাগে।

(২) বীজ বোনার সময় সার প্রয়োগ ঃ

বীজ বোনা বা রোয়ার কিছু আগে বা ঠিক আগে সার প্রয়োগকে প্রাথমিক সার বা মূলসার প্রয়োগ বলা যেতে পারে। নাইট্রোজেন সারের সবটা এক সঙ্গে না দিয়ে

কিছুটা বীজ বোনার সময় এবং বাকিটা গাছ বাড়ার বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগে ভাগে দেওয়া উচিত। জমিতে রস বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে নাইট্রেটঘটিত নাইট্রোজেন সার চুইয়ে নষ্ট হতে পারে।

ফসল বাড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচুর ফসফরাস প্রয়োজন। এজন্য নির্দিষ্ট ফসলের জন্য সুপারিশকৃত মোট সারই বীজ বোনার সময় প্রাথমিক সার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়। পটাশও গাছপালা প্রথম থেকে নিতে শুরু করে। এজন্য পটাশও বীজ বোনার আগে মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত।

(৩) বীজ বোনার পর সার প্রয়োগ ঃ

শস্য বড় হয়ে যাবার পর সার প্রয়োগকে চাপান সার বলা হয়। ধান গাছে পাশকাঠি ও ফুল আসার মুখে নাইট্রোজেন চাপান দিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। শস্য অনুসারে চাপান দেবার সময় এর মাত্রা নির্ভর করে। কিছু ক্ষেত্রে হালকা মাটিতে পটাশ সারের কিছু অংশ চাপান হিসাবে সুপারিশ করা হয়ে থাকে। অবশ্য বহুবর্ষজীবী গাছে মূল সার প্রয়োগ করলেও বিশেষ করে ফল গাছে বর্ষার আগে ও পরে দুবার নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করা দরকার।

(গ) জমিতে জৈব সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

অনেক চাষী জৈব সার বীজ বোনার মত ছিটিয়ে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি দুবার মাটিতে দিয়ে দেয়। এটা ভাল পদ্ধতি, কারণ এতে সারা জমিতেই সার ছড়িয়ে পড়ে। অনেক চাষী আবার গরুর গাড়ি করে আবর্জনা সার নিয়ে জমিতে ছোট ছোট স্তূপ করে দীর্ঘ কাল রেখে দেয়। এতে সারের কর্মক্ষমতা ও উদ্ভিদখাদ্য গুণ অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় রোদে, জলে, বাতাসে। সুতরাং জমিতে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবর্জনা বা কম্পোষ্ট সার মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত।

রাসায়নিক সার নিচে বলা ৬ ভাবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

(১) ছিটিয়ে (২) চাপান হিসাবে (৩) পাতায় স্প্রের মাধ্যমে (৪) আকাশ থেকে ছড়িয়ে (৫) ইনজেকসন ও (৬) সেচের জলের মাধ্যমে।

(১) ছিটিয়ে ঃ

বীজ বোনার মত হাতে ছিটিয়ে বীজ বোনার আগে জমিতে বা ফসলেরমধ্যে দেওয়া হয়। বেশি মাত্রায় ফসফেটঘটিত সার বিশেষ করে রক ফসফেট জাতীয় সার ঘন

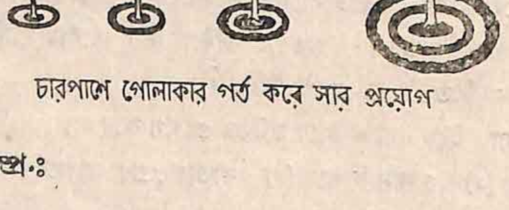
ফসলের মধ্যে দিয়ে সুফল পাওয়া যায়। তবে এতে আগাছার উৎপাত বাড়ে ও সারের অপচয় হয়।

(২) চাপান হিসাবে ঃ

এ ভাবে প্রয়োজনে অল্প মাত্রায়ও সার প্রয়োগ করা যায়। আলু, ভুট্টা ইত্যাদি গাছের মূলের কাছাকাছি প্রয়োগ করায় গাছ সহজেই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। নাইট্রোজেন অপচয় এতে কম হয়। এই পদ্ধতিতে গাছের একপাশে, বা চারপাশে শস্যের লাইনের একপাশে, দুই লাইনের মাঝখানে সার প্রয়োগ করা যায়। কোন পদ্ধতিটি শ্রেষ্ঠ তা নির্ভর করে কী ধরণের শস্য, মাটি, আবহাওয়া, সার ইত্যাদির উপর।

দ্রুত দ্রবণীয় নাইট্রোজেন এবং পটাশঘটিত সার বীজের সঙ্গে লাগলে ক্ষতি হতে পারে। বরং ফসফেটঘটিত সার বীজের কাছাকাছি বা দু লাইনের মাঝে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। ফল বা বড় ফল গাছের চারপাশে গোলাকার গর্ত করে সার প্রয়োগেও ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে গাছের গভীরে মূল হলে এজন্য গর্ত গভীর করে সার প্রয়োগ করতে হবে।

ফল গাছের চারপাশে গর্ত করে সার প্রয়োগ ঃ



চারপাশে গোলাকার গর্ত করে সার প্রয়োগ

(৩) পাতায় স্প্রে ঃ

এই পদ্ধতিতে সার জলে মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করা হয়। শস্য ও সার অনুসারে মিশ্রণে সার ও জলের মাত্রা নির্ভর করে। জলে সারের মাত্রা সঠিক না হলে পাতা জ্বলে গিয়ে শস্যের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। মিশ্রণে কতটা জল ও সার দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কী যন্ত্রে ব্যবহার করা এবং কী গাছে প্রয়োগ করা হবে তার উপর। নাইট্রোজেনের জন্য ইউরিয়া-মিশ্রণ ইদানিং খুব ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে পাট, চা,

কফি ইত্যাদির পাতায় এভাবে সার প্রয়োগ বাড়ছে। লোহা, তামা, বোরন, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি অণুখাদ্য-মিশ্রণ এভাবে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজনে পরিমাণমত কীটনাশক ওষুধও এই মিশ্রণে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৪) আকাশ থেকে ছড়ান ঃ

উড়োজাহাজ বা হেলিক্যাপটারের মাধ্যমে বিরাট এলাকার শস্য ক্ষেত্র, বনভূমি বা পাহাড় এলাকায় এভাবে সার প্রয়োগ করা যায়। এ ব্যবস্থা উন্নত দেশে চালু থাকলেও আমাদের দেশে সম্প্রতি চালু হয়েছে।

(৫) জমিতে ইনজেকসন করে ঃ

এই পদ্ধতিতে তরল সার ৩/৪ ইঞ্চি মাটির নিচে প্রয়োগ করা যায়, বিশেষ করে ধানের মাঠে এই পদ্ধতির এখনও ততটা প্রয়োগ হয়নি।

(৬) সেচের জলের মাধ্যমে ঃ

সেচ-সেবিত এলাকায় সেচের জলের মাধ্যমে এই সার প্রয়োগ করা হয়। সেচের জলের প্রবাহের সঙ্গে পরিমাণমত তরল সার প্রয়োগের জন্য পরিমাণ জ্ঞাপক মিটার আছে। এ পদ্ধতিও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়নি।

সার প্রয়োগে ৯ দফা নিয়ম ঃ

জমিতে সার কি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে তা মূলত নির্ভর করে জমি, মাটি, শস্য, জলবায়ু, সময়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কি পরিমাণ কোন সার প্রয়োগ করা হবে তার উপর। উদ্দেশ্যটা হল সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সব চেয়ে বেশি লাভ হয় এবং অপচয় কম হয়।

(১) সঠিক পরিমাণে সুষম সার প্রয়োগ করতে হলে জমির মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করা উচিত।

(২) রাসায়নিক সার বীজ বোনা, চারা রোয়ার আগে, এমনকি চাপান সার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। এ সার গুঁড়ো, দানা হিসাবে বা জলে মিশিয়ে ব্যবহার করাই ভাল। এই সার প্রয়োগের পর জমিতে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া উচিত।

(৩) জৈব সার বা খইল বোনার সময় ব্যবহার করা গেলেও বোনার ১ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে জমিতে প্রয়োগ করাই উচিত। ফুলকপি, বাঁধা কপি, আলু ইত্যাদি চারা

রোয়ার পরও অল্পপরিমাণে গুঁড়ো খইল দেওয়া যায়। সার সব সময়েই ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এবং সার প্রয়োগের পর জলসেচ দিতে হবে।

(৪) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত জৈবসার বীজ বোনার ৩/৪ সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করা দরকার।

(৫) ফসল অনুসারে শেষ চাষের সময় পুরো ফসফেট ও পটাশ দেওয়া যেতে পারে এবং নাইট্রোজেন সার মূল ও চাপান হিসাবে ২/৩ বারে প্রয়োগ করাই ভাল।

(৬) ফসফেট ও পটাশ সার গাছের মূল বা শিকড়ের কাছাকাছি মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিন।

(৭) নাইট্রোজেন সারের মধ্যে ইউরিয়াই জলে গুলে স্প্রেয়ার দিয়ে শস্যের পাতায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ্যামোনিয়াম সালফেট পাতায় স্প্রে করলে সাধারণতঃ পাতা কুঁকড়ে যায়, ফলন কমে যায়।

(৮) গাছের খাদ্য উপাদনগুলি সহজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অম্ল ও ক্ষার মাটিতে সার প্রয়োগের আগে ঐ মাটি সংশোধন করে নেওয়া উচিত।

(৯) সার প্রয়োগের আগে কৃষি বিজ্ঞানীদের সুপারিশ ও পরামর্শ ঠিকভাবে মেনে চলা দরকার।

সঠিকভাবে সার প্রয়োগের কিছু পরামর্শ ঃ নাইট্রোজেন ঃ

(১) ধান জমিতে এ্যামোনিয়া ঘটিত নাইট্রোজেন সার ২ থেকে ৪ ইঞ্চি গভীরে প্রয়োগ করলে মাটির উপরে প্রয়োগের চেয়ে তুলনায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ বেশি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে।

(২) জলজমা জমিতে ইউরিয়ার অপচয় বেশি হয়। সেখানে এ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া গেলে এর প্রয়োগে তুলনায় ভাল কাজ হবে। এ জন্য জল নিয়ন্ত্রণ বা সারের সঠিক নির্বাচন দরকার।

(৩) গাছের ফুলফল আসার মুখে চাপান হিসাবে নাইট্রেট নাইট্রোজেন সার দিলে অপচয় কম ও গাছ বেশি গ্রহণ করতে পারে।

(৪) গাছের শিকড় মাটির উপরের অংশে ছড়িয়ে পড়ার সময় নাইট্রোজেন চাপান সার দেওয়া দরকার।

(৫) স্বল্প মেয়াদি জাতের ধানে প্রথম দিকে ও দীর্ঘ মেয়াদি জাতের ধানে নাইট্রোজেন দিয়ে চাপান বেশি করে দেওয়া দরকার। ছিটিয়ে বোনা ধানে প্রথম দিকে কম এবং চাপান হিসাবে বেশি নাইট্রোজেন দিতে হবে।

(৬) গাছ বড় হয়ে পাতা বিস্তৃতি লাভ করলে পাতায় জলেগোলা ইউরিয়া স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ফসফরাস ঃ

মাটিতে সারের আকারে যে ফসফরাস দেওয়া হয় তার অধিকাংশই অপচয় হয়, গাছ গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য ফসফরাসকে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করার জন্য—

(১) ফসফরাস মাটির উপর দিকে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(২) এই সারকে মাটির গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ দরকার।

(৩) চাষের শেষের দিকের চেয়ে প্রথম দিকে প্রয়োগে ফসলে এই সারের কার্যকারিতা বাড়ে।

(৪) নাইট্রোজেন ও ফসফরাস একত্রে প্রয়োগে উদ্ভিদ এই দুই সারই বেশি গ্রহণ করতে পারে।

আরো কিছু পরামর্শ ঃ

(১) চাষের আগে ঃ

চাষের আগে জমিতে প্রাথমিক বা মূলসার ব্যবহার করলে এই সার মাটির সঙ্গে মিশে অনেকটা নিচে যেতে পারে। ফসলের কাছে এই সার সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়। যে জমিতে নিয়মিত বেশি সার দিতে হয়। সেখানে এভাবেই সার প্রয়োগ করা দরকার, বিশেষ করে যে জমি থেকে অন্তবর্তী ফসল তোলা হয়। যেখানে ফসল সারিতে বোনা হয় সেখানে দুই সারির মধ্যে সার প্রয়োগ করলে ফল ভাল হয়।

(২) চাষের পরে ঃ

জমিতে ভাল করে লাঙ্গল-মই দিয়ে চাষ করে বীজ বোনা বা চারা রোয়ার কিছুদিন আগে প্রয়োজনীয় মাত্রায় সার প্রয়োগ করা দরকার।

(৩) আলের মধ্যে ঃ

আলু, গাজর, বীট, পেঁয়াজ ইত্যাদি মূলজাতীয় ফসল সাধারণতঃ লাইন করে

ছক (৩৪) **ভারতে গত কয়েক বছরের সার চিত্র : (হাজার মেঃ টন হিসাবে) :**

বছর	উৎপাদন ক্ষমতা		প্রকৃত উৎপাদন		ব্যবহার		ঘাটতি	
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	নাইট্রোজেন	ফসফরাস
১৯৮১-৮২	৫২৫২	১৫৩৯	৩৬৮৫	১০৪০	৪৭৩৪	১৯৫৬	১০৪৯	৩১৬
১৯৮২-৮৩	৫৭৪৯	১৫৩৯	৩৯৯০	১০৪০	৫২৭০	১৪৮৫	১২৮০	৪০৬
১৯৮৩-৮৪	৭০৭৭	২০২৬	৪৬২০	১২৭৫	৫৮৩৭	১৬২০	১২১৭	৩৪৫
১৯৮৪-৮৫	৫৫৯২	২৭৬৭.৬	৩৯১৭.৩	১৩১৭.৮	৫৪৮৬	১৮৮৬.৪		
১৯৮৫-৮৬	৬৬৯৫	২০৮৯.৫	৪৩২২.৯	১৪৩০.১	৫৮১১.৪	২০৬৩.৩		
১৯৮৬-৮৭	৭১০৮	২৫৫৯	৫১০০	১৭৫০				

সূত্র : ফার্টিলাইজার নিউজ অক্টোবর ১৯৮৬, ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া।

রোয়া হয়। এইসব চাষে চারার একদিকে বা দুদিকে ও চারার নিচের দিকে লাইনে সার দিয়ে সুফল পাওয়া যায়।

(৪) সাইড ড্রেসিং ঃ

বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি চাষে যেখানে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনজাতীয় সার প্রয়োজন সেখানে আলের পাশে লাইন করে সার প্রয়োগ করা হয়।

(৫) গর্ত বা নালায় সার প্রয়োগ ঃ

কিছু কিছু ফসল আছে সারিতে রোয়া হয় এবং দু-সারির মাঝখানে নালা রাখা হয়। প্রতিটি নালায় পরিমাণ মত সার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সারি বা আইলের গাছ তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। কোথাও বা নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইনেও এই সার দেওয়া হয়। আখের ক্ষেতে এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ খুব কার্যকরি।

কী নিয়মে সার প্রয়োগ করা হবে তা নির্ভর করে শস্য, মাটি, জলবায়ু, সময়, কী পরিমাণে কোন সার ও কী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে তার উপর। প্রধান কথা হল সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সবচেয়ে বেশি কাজ হয় ও অপচয় কম হয়।

গুদামে সার রাখতে সাবধানতা ঃ

দামী সার সাবধানে রক্ষণা-বেক্ষণ না করলে সারের অপচয় হতে পারে, আবার রাখার দোষে এর গুণাগুণও নষ্ট হতে পারে। আগে থেকে সার সংগ্রহ করে না রাখলে ঠিক প্রয়োজনের সময়ে অসুবিধা হতে পারে।

(১) সারের বস্তায় জল বা ঠাণ্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) মাটি বা সিমেণ্টের উপর সার রাখলে সার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এজন্য কাঠের গুঁড়ো, তুষ, ধানের খড় প্লাসটিক সীট মেঝেতে দিয়ে তার উপর ইট, সিমেণ্ট, বাঁশ, কাঠের তক্তা দিয়ে পাটাতন করে তার উপর বস্তা রাখতে হবে।

(৩) প্রতি গাদায় ৭।৮ বস্তার বেশি রাখলে উপরের বস্তার চাপে নিচের বস্তাগুলির সার দলা পাকিয়ে যেতে পারে।

(৪) যে ঘরে বা গুঁদামে সার রাখবেন তার দেয়াল, বেড়া, ছাদ দিয়ে যেন জল না আসে তারজন্য সময়ে মেরামত দরকার।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সার আলাদা আলাদা ঘরে রাখা সম্ভব না হলে ভিন্ন ভিন্ন গাদায় রাখবেন।

(৬) গাদার মাঝখান দিয়ে যাতায়তের রাস্তা রাখতে হবে।

(৭) সারের খাদ্য উপাদান যাতে ঠিক থাকে তার জন্য বস্তায় রোদ, আদ্র্তা, বৃষ্টির ছাট, ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে সেদিকে নজর দিতে হবে।

(৮) ছেড়া বা খোলা বস্তায় সার রাখা উচিত নয়।

(৯) বিনা প্রয়োজনে গুদামের দরজা ও জানালা খোলা রাখা উচিত নয়।

(১০) সূর্যালোক বা আগুনের তাপ থেকে সারের বস্তা দূরে রাখতে হবে।

(১১) সারের বস্তা উঠানো-নামানোর জন্য কাঁটা ব্যবহার করা উচিত না।

(১২) বস্তা সাবধানে নামাতে উঠাতে হবে। বস্তা ছুঁড়ে ফেলা বা এলোপাথাড়ি রাখাও উচিত না।

সহায়ক পুস্তক ঃ

১। হ্যাণ্ডবুক অব ম্যানুওরস এ্যাণ্ড ফার্টিলাইজার্স—ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ।

২। হ্যাণ্ডবুক অব এ্যাগ্রিকালচার— ঐ

৩। ফার্টিলাইজার হ্যাণ্ডবুক অন ইউজেস—দি ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া।

৪। হ্যাণ্ডবুক অব ফার্টিলাইজার টেকনোলজি— ঐ

৫। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি— ঐ

৬। হাউ টু ইউজ ফার্টিলাইজার্স—ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ।

৭। এফিসিয়েণ্ট ইউজ অফ ফার্টিলাইজারস—খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘ।

৮। ম্যানুওরস এ্যাণ্ড ফার্টিলাইজারস—কে. এস. ইয়ালকার এবং জে. পি. আগরওয়াল।

৯। ফ্যাক্টস এ্যাবাউট ফার্টিলাইজার্স—ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ।

১০। কৃষি সহায়িকা—(১৯৮১)—ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ।

১১। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা।

১২। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা।

১৩। হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা।

১৪। সার সমাচার ও চাষবাস কৃষি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।

১৫। স্ট্যাটিসটিকস্ অন ফার্টিলাইজার এ্যাণ্ড এগ্রিকালচার ইন ইষ্টার্ন ইণ্ডিয়া—দি ফার্টিলাইজার এ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া।

১৬। সার বিজ্ঞান ও ব্যবহার—ডঃ অজয়কুমার কর।

১৭। ধানের জন্য সার প্রয়োগের বিশেষ বিশ্লেষণ 'ধান উৎপাদন' পুস্তক (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।)

পরিভাষা শব্দকোষ ঃ Glossary

আত্মীকরণ—Absorption,
আকাদেমী—Academy,
পল্লীউন্নয়ন—Rural Development,
মাটি—Soil,
জৈব—Organic,
অজৈব—Inorganic,
সার – Fertilizer, Manure,
খাদ্য—Food,
পুষ্টি—Nutrition,
কার্বন—Carbon,
হাইড্রোজেন—Hydrogen,
অক্সিজেন—Oxigen,
নাইট্রোজেন—Nitrogen,
ফসফরাস—Phosphorus,
পটাশিয়াম—Potassium,
ক্যালসিয়াম—Calcium,
ম্যাগনেসিয়াম – Magnesium,
সালফার – Sulphur,
লোহা—Iron,
দস্তা – Zinc,
তামা—Copper,
ম্যাঙ্গানিজ—Manganese,
বোরন—Boron,
মলিবডেনাম—Molybdenum.
ক্লোরিন—Chlorine,
উপাদান – Ingredient,
ক্লোরোফিল – Chlorophyl,
বাতাস—Air,
হাইড্রোজেন গ্যাস—Hydrogen Gas,
এ্যামেনিয়া গ্যাস— Ammonia Gas,
সোডিয়াম—Sodium,
সিলিকন—Silicon,
কোবাল্ট—Cobalt,
আয়োডিন—Iodin e,
বেরিয়াম—Barium,
ন্যাপথা—Naphtha,
কয়লা—Coal,
এসিড—Acid,
জ্বালানি—Fuel,
হাইড্রোকারবন—Hydro Carbon,
এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট—Ammonium Nitrate,
এ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড—Ammonium Cloride,
এ্যামোনিয়াম ফসফেট—Ammonium Phosphate
এ্যামোনিয়াম সালফেট—Ammonium Sulphate,
চিনি—Sugar,
অম্লত্ব—Acidic,
ইউরিয়া—Urea,
সুপার ফসফেট—Super Phosphate,
পটাশ—Potash,

চুনাপাথর—Lime Stone,
ডলোমাইট—Dolomite,
নাইট্রিক এসিড—Nitric Acid,
নাইট্রাস অকসাইড—Nitrous Oxide,
ক্যালসিয়াম অকসাইড—Calcium Oxide,
ম্যাগনেসিয়াম অকসাইড—Magnesium Oxide,
আবৃত—Coated,
অনাবৃত--Uncoated,
ক্যালসিয়াম কার্বনেট—Calcium Carbonate,
মূলসার—Basic Fertilizer,
চাপান সার—Top Dressing,
কার্বন ডাই অক্সাইড—Carbon di Oxide,
লাক্ষা আচ্ছাদিত ইউরিয়া—Lac Coated Urea,
গন্ধকআবৃত ইউরিয়া—Sulphur Coated Urea,
আলু—Potato,
টমেটো—Tomato,
ধান—Paddy,
ভুট্টা—Maize,
গম—Wheat,
জোয়ার—Jowar,
বাজরা—Bajra,
পাট – Jute,
আখ—Sugar Cane,
তুলা—Cotton,
তৈলবীজ—Oil Seed,
ফল—Fruits,
ফুল—Flowers,
বাহারীগাছ—Ornamental trees,
লতা—Creeper,
বেগুন—Brinjal,
সরষে—Mustard,
চীনাবাদাম—Ground Nut,
ফলন—Yield,
ফসফোলিপিও—Phospholipeo,
ফাইটিন—Phytin,
নিউক্লিও প্রোটিন—Nucleo Protein,
এনার্জি—Energy,
সালোক সংশ্লেষ—Photo-synthesis,
বিচালি—Straw,
মাটি পরীক্ষা—Soil test,
জিপসাম—Gypsum,
মনো-ক্যালসিয়াম ফসফেট—Mono-Calcium Phosphate,
সিঙ্গল সুপার ফসফেট—Single Super Phosphate,
ট্রিপল সুপার ফসফেট—Triple Super Phosphate,
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট—Di-Calcium Phosphate,
হাড়গুঁড়ো—Bone Dust,
বেসিক স্ল্যাগ—Basic Slag,
রক ফসফেট - Rock Phosphate,
সালফিউরিক এসিড—Sulphuric Acid,

চা—Tea,
তুঁতে—Copper Sulphate,
আনারস—Pine Apple,
রবার—Rubber,
কফি—Coffee,
বাদামী দাগ—Brown Spot,
ঝলসা—Blast,
নাবি ধসা—Late Blight,
পাউডারি মিলডিউ—Powdery Mildew,
খরা—Drought,
সবজি—Vegetable,
শিকড়—Root,
তামাক—Tobacco,
কলা—Banana,
নারকেল—Coconut,
শালগম—Turnip,
বীট—Beet,
গাজর—Carrot,
লংকা—Chilli,
রসুন—Garlic,
পেঁয়াজ—Onion,
ঢ্যাঁড়স—Okra,
ফুলকপি—Cauliflower,
কচু—Aroids,
ওল—Elephant foot,
ওলকপি—Knolkhol,
মুলা—Radish,
পালংশাক—Beet leaf,
লেটুস—Lettuce,
মেথি—Fenugreek,
পুঁইশাক—Indian Spinach,
কাটোয়া ডাঁটা—Amaranthus (Katwa)
পটল—Pointed Gourd,
লাউ—Bottle Gourd,
মিষ্টি কুমড়ো—Pumpkin,
করলা—Bitter Gourd,
ঝিঙা—Ridge Gourd,
শশা—Cucumber,
তরমুজ—Water Melon,
চিচিঙা—Snake Gourd,
কড়াইশুঁটি—Peas,
বরবটি—Cowpea,
সীম—Bean,
ফ্রেঞ্চবীন—French Bean,
মিষ্টি আলু—Sweet Potato,
চালকুমড়ো—Wax Gourd,
সূর্যমুখী—Sun Flower,
তিল—Sesamum,
আদা—Ginger,
জিরা—Cumin seed,
ধনে—Coriander,
অনুখাদ্য—Micro Nutrients,
সুফলা—Suphala,
পর্যায়—Grade,
অনুপাত—Ratio,
মিশ্রসার—Mixture Fertilizer,
যৌগিক সার—Compound Fertilizer,
নমুনা মাটি—Sample Soil,